নারায়ণ সান্যাল

শার্লক হেবো

শার্লক হেবো

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা-৭

SHARLOK HABO

(Juvenile Detective stories)

By NARAYAN SANYAL

প্রথম উজ্জ্বল সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, বইমেলা

প্রচ্ছদ
কমল ব্যানার্জী

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির-এর পক্ষ হইতে শ্রীমতী সুপ্রিয়া পাল দ্বারা প্রকাশিত
ও লাইট অফসেট প্রাঃ লিমিটেড কর্তৃক মুদ্রিত

কুড়ি টাকা

● কৈফিয়ৎ

"শার্লক হেবো" ষাটের দশকের শেষ দিকে লেখা। প্রথম প্রকাশের সময় বইটি উৎসর্গ করেছিলাম সদ্যপ্রয়াত অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে। তারপর দীর্ঘদিন পৃথক পুস্তক হিসাবে বইটি ছাপা ছিল না। যদিও সংকলনগ্রন্থে ছিল। এতদিন পুনর্মুদ্রণ করিনি একটি বিশেষ হেতুতে : ইচ্ছা ছিল আরও কিছু ছোট গল্প লিখব হেবোকে নায়ক করে। এতদিনে বুঝেছি, সেটা আর হয়ে উঠবে না। তাই এই পুনর্মুদ্রণ।

এই বইতে প্রখ্যাত ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী অনেকগুলি ছবি এঁকে দিয়েছেন। চণ্ডীবাবু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুস্থানীয়। তাঁর ছবির অনুকরণ ও অনুসরণ করে আম্মো দু-চারটি ছবি এঁকেছি। এটি কোনও গুরুগম্ভীর গ্রন্থ হলে ও-কাজ নিশ্চয় করতাম না। তাই আশা করছি ক্ষুদ্র পাঠক-পাঠিকা এটা মেনে নেবে আর বয়স্ক পাঠক-পাঠিকা সকৌতুকে লক্ষ্য করবেন চণ্ডী লাহিড়ীর অনন্নুকরণীয় শৈলী অনুকরণে আমি কতটা ব্যর্থ হয়েছি।

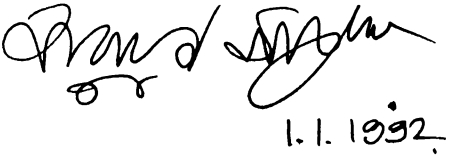

1.1.1992

নারায়ণ সান্যালের

ছোটদের জন্য লেখা বই

নাম	বিষয়	বয়স (পাঠক/পাঠিকার)
১। গাছ মা	যুক্তাক্ষর বর্জিত গল্প...	৪—৬
২। হাতি আর হাতি	ঐ ...	৫—৭
৩। নাক উঁচু	নাটক ...	৬—১০
৪। ডিজনেল্যান্ড	ভ্রমণকাহিনী ...	৭—১৬
৫। রাস্কেল	গল্প ...	৮—১৬
৬। না-মানুষের পাঁচালী	ঐ ...	৭—১২
৭। না-মানুষের কাহিনী	ঐ ...	১০—১৫
৮। কিশোর অমনিবাস	অমনিবাস ...	১০—১৬
৯। অরিগামি	কাগজ-শিল্প ...	৮—১৮
১০। না-মানুষী বিশ্বকোষ (এক) অমেরুদণ্ডী	বিশ্বকোষ ...	৮—১৮
১১। না-মানুষী বিশ্বকোষ (দুই) মাছি থেকে পাখি	ঐ	৮—১৮

শার্লক হেবো

গুরুবিদায় পর্ব

শার্লক হেবোর পরিচয় দিয়ে এই কাহিনী শুরু করতে হল বলে আমার নিজেরই কেমন যেন লজ্জা করছে। কিন্তু উপায় কী? এখনও যে হেবো যথেষ্ট বড় হয়নি। তাই তোমরা তাকে চেন না কেউ। বছর-দশেক পরে যে হেবোর সামনে অটোগ্রাফ খাতাখানা মেলে ধরে তোমাদের সবাইকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে হবে—সেই হেবোরই পরিচয় দিতে হচ্ছে আজ তোমাদের কাছে।

হেবো জন্ম-ডিটেক্টিভ। বাংলার ভবিষ্যৎ শার্লক হোমস্। হেবোকে না চিনলেও শার্লক হোম্‌সকে নিশ্চয় চেন তোমরা। স্যার আর্থার কনান ডয়েলের অমর সৃষ্টি গোয়েন্দা-কুলতিলক শার্লক হোমসের কাহিনী দুনিয়াসুদ্ধ লোক জানে। হেবোর কাকা মাসিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে ডিটেকটিভ গল্প লেখেন, তাছাড়া ওর মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু পুলিসের একজন বড় অফিসার। সুতরাং ছেলেবেলা থেকে চোর ডাকাতের কথা শুনে শুনে তাদের ধরনধারণ ভালই জানা ছিল হেবোর। এ ছাড়া ওর মেজদা মাঝে-মাঝে লাইব্রেরি থেকে লুকিয়ে ডিটেকটিভ বই নিয়ে আসত, আর বাবা-মা-কাকাদের চোখ এড়িয়ে উপক্রমণিকা আড়াল দিয়ে মেজদা সেগুলো নিয়ে গোগ্রাসে গিলত। বড়রা কেউ টের পেতেন না, এমনভাবে লুকিয়ে রাখত সে বইগুলো। কখনও পুরানো খবরের কাগজের স্তূপের নিচে, কখনও আলমারির পিছনে, কখনও বা রান্নাঘরের কুলুঙ্গিতে, আচারের শিশিগুলোর

পিছনে। হেবো আবার মেজদার নজর এড়িয়ে সেগুলি যথারীতি হস্তগত করত, আর একের পর এক শেষ করে ফেলত। অসংখ্য গোয়েন্দা-গল্প পড়ে পড়ে চোর ধরা ব্যাপারটা তার কাছে 'জলবৎ তরলং' হয়ে গেছে। মাথাটা হেবোর এমনিতেই বেশ সাফা। হেডমাস্টার মশাই বলেন, মন দিয়ে পড়লে ও নিশ্চয়ই ক্লাসে ফার্স্ট হত। কিন্তু হেবোকে গোয়েন্দাগিরির ভূতে পেয়েছে—পাশ করার জন্য যেটুকু দরকার শুধু সেইটুকু সম্পর্ক সে বজায় রেখেছে পড়ার বইয়ের সঙ্গে। বাকি সময় সে মেতে থাকে তার গোয়েন্দাগিরির মালমশলা নিয়ে। ডিটেকটিভ-সুলভ সবকয়টি গুণই আছে তার : তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, অনুসন্ধিৎসা, সূক্ষ্ম যুক্তির বিশ্লেষণ, ইনটুইশান, সাহস আর ধৈর্য। এ কাজের যাবতীয় সরঞ্জাম সে একে একে সংগ্রহ করেছে। নোটবই, ডায়রি, মেজদির সেলাইয়ের বাক্স থেকে উদ্ধার-করা একটা ছেঁড়া মাপবার ফিতে, দাদুর বাতিল চশমার পুরু একটা লেন্স। নোটবইতে সময়ে অসময়ে হেবো অনেক কিছু টুকে রাখে। কোন সমস্যার ক্লু কখন কোথায় দরকার হবে তা কি কেউ আগে থেকে বলতে পারে? মেজদা ওর চেয়ে দু বছরের বড়—শার্লক হেবো নামটা সেই দিয়েছে ঠাট্টা করে; পদে পদে সে চায় হেবোকে অপদস্থ করতে। নোটবইয়ের কথা উঠলে মেজদা বলে—হেবোর নোটবইতে সব খবরই লেখা আছে, শুধু লেখা নেই—'পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়।'

হেবো রাগ করে না। বিজ্ঞের মত হাসে শুধু।

মেজদা না মানলেও, হেবো যে সত্যিকারের একজন ক্ষুদে গোয়েন্দা, তার প্রমাণ সে দিয়েছিল। পর-পর দু-তিনটি রহস্যের কিনারা সে করে ফেলেছিল তার কিশোর বয়সের বুদ্ধিতে। তোমরা হয়ত খবর রাখ, নয় তো রাখ না। তা, তোমরা না জানলেও হেবোর বাড়ির এবং পাড়ার লোকেরা মেনে নিয়েছিল, হেবো একটি হবু গোয়েন্দা। পলাশপুরে হেবোর দাদু একবার রীতিমত এক ষড়যন্ত্রের রহস্যজালে মারা পড়তে বসেছিলেন; ব্যাপারটা এতই ঘোরালো হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত হেবোর মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু একজন প্রফেশনাল গোয়ন্দাকে নিয়োগ করেছিলেন। হেবো তাঁকে প্রবীরকাকু বলে ডাকত। হেবো আর তার প্রবীরকাকু মিলে সে রহস্যের কিনারা করেছিল। মোট কথা সেই থেকে প্রবীরবাবু হেবোকে মোটামুটি শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন, যদিও হেবো মাত্র পনের বছরের কিশোর,—ক্লাশ টেন-এ পড়ে।

পলাশপুরের রহস্যটা সমাধান হওয়ার পর কোথায় হেবোর বাবা খুশি হবেন তা নয়, তিনি কড়া হুকুম জারি করেছিলেন—গোয়েন্দাগিরি হেবোকে একেবারে ছেড়ে দিতে হবে, যতদিন না সে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে। বাধ্য হয়ে হেবো তার গোয়েন্দাগিরির সাজ-সরঞ্জাম তুলে রেখে পড়াশুনায় মন দিয়েছিল।

কিন্তু ভবিষ্যতে যাকে শার্লক হোমসের মত বড় গোয়েন্দা হতে হবে, তার কপালে শুধু পড়া মুখস্ত করার ব্যাপারটা কেন লিখবেন ভগবান? মাসকতক পরে আবার একদিন হেবোকে ডেকে পাঠালেন তার কাকা। হেবো ভেবেছিল, আবার বুঝি এক প্রস্থ উপদেশ বর্ষিত

হবে তার উপর। উপায় নেই, এখন মাঝে-মাঝেই তাকে ডেকে কাকা নানান উপদেশ দেন—খোঁজ খবর নেন, সে গোয়েন্দাগিরি ছেড়েছে কি না। বই বন্ধ করে হেবো এসে হাজিরা দেয় কাকার ঘরে। কাকা সস্নেহে ডেকে বলেন—'আয় বোস।'

সুরটা যেন অন্য রকম লাগছে? মুখ তুলে হেবো দেখতে পায়—ঘরে বসে আছেন কাকা, কাকীমা আর সেই পলাশপুরের প্রবীরকাকু। প্রবীরকাকু বলেন, 'কেমন আছ হেবো?'

হেবো হাসে, জবাব দেয় না।

কাকা বলেন, 'তোকে একটি জরুরী কাজে ডেকেছি হেবো। মানে আমরা একটা বিপদে পড়েছি। কী করব স্থির করে উঠতে পারছি না। তোর তো এসব বিষয়ে বেশ বুদ্ধি খোলে, তাই—'

হঠাৎ থেমে পড়েন কাকাবাবু। হেবো মনে মনে উৎফুল্ল হলেও মুখে সে-ভাব প্রকাশ করে না।

প্রবীরবাবু আলোচনার সূত্রটা তুলে নিয়ে বলতে থাকেন, 'সত্যি করে বলতে কি, তোমার কাকিমা এ কাজে আমার সাহায্য চেয়েছেন। ব্যাপারটা জটিল; কিন্তু আমি বলেছি, আমার সহকারী হিসাবে যদি শ্রীমান শার্লক হেবো কাজ করে তবেই এ দায়িত্বটা নিতে পারি।'

হেবো একটু অবাক হয়ে বলে, 'কাকিমা? তোমার বিপদ?'

প্রবীরকাকু ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়ে বলেন, 'না, বিপদটা ঠিক তোমার কাকিমার নয়—তাঁর ছোট বোন মঞ্জুলা দেবীর। ব্যাপারটা এই—'

আদ্যোপান্ত ঘটনাটা হেবো মন দিয়ে শোনে।

হেবোর কাকিমারা দুই বোন। কাকিমার ছোট বোন মঞ্জুলা দেবীর বিয়ে হয়েছিল কৃষ্ণনগরের একজন নামকরা উকিল সুধাকান্তবাবুর একমাত্র ছেলে নির্মলেন্দুর সঙ্গে। সুধাকান্তের আর সন্তানাদি নেই। স্ত্রীও দীর্ঘদিন গত। কৃষ্ণনগরের রায়পাড়ায় মস্ত বড় বাড়ি। যথেষ্ট রোজগার করেছেন জীবনে। এখন অবসরপ্রাপ্ত মানুষ। সত্তরের ওপর বয়স। ছেলে নির্মলেন্দুই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। শেষ দিকে তন্ত্র-সাধনার দিকে ঝোঁকটা হয়েছে বৃদ্ধের। শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন, পূজা-অর্চনাতেই দিন কাটে। নির্মলেন্দুর সঙ্গে মঞ্জুলার বিয়ে হয়েছিল বছর-পাঁচেক আগে। নির্মলেন্দু ছিল দক্ষিণ রেলওয়ের একজন অফিসার। ফলে বিয়ের পর থেকেই মঞ্জুলা বরাবর স্বামীর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের এখানে ওখানে ঘুরেছে। শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হবার সুযোগ হয়নি। ছুটি ছাটায় নির্মলেন্দু যখন বাড়ি এসেছে তখন মঞ্জুলাও এসেছে, এবং সুধাকান্তের সেবা যত্নের কোন ত্রুটি করেনি। বিয়ের মাস-খানেক আগেই নির্মলেন্দু চাকুরিতে ঢুকেছিল, আর বিয়ের মাস-দুয়েক পরেই সে বদলি হয়ে যায় মাদ্রাজে। ফলে মঞ্জুলার পক্ষে শ্বশুরের ঘর করাটা ঘটেনি। এখন মজা হচ্ছে এই যে, সুধাকান্তবাবুর ধারণা হল, এই অপয়া বউয়ের জন্যই নির্মলেন্দু তার বাপকে ত্যাগ করে গেল। এ ধারণার পিছনে কোন যুক্তি নেই। সুধাকান্তবাবু একজন নামকরা

উকিল ছিলেন, যুক্তির উপর নির্ভর করে কত বড় বড় কেসে জিতেছেন তিনি; অথচ এখন একেবারে বিনা যুক্তিতে ছেলেমানুষের মত তিনি অভিমান করে রইলেন পুত্রবধূর উপর। বেচারি মঞ্জুলা এ অভিমান ভাঙাবার নানান চেষ্টা করেছে। স্বামীকে ছেড়ে কৃষ্ণনগরে শ্বশুরের কাছে এসে থাকতে চেয়েছে, কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। সুধাকান্ত তো পুত্রবধূর সেবার জন্য কাতর নন, তিনি চাইছেন পুত্রের সান্নিধ্য। অথচ সে বেচারা চাকরি ছেড়ে বারে বারে এতদূর আসেই বা কী করে? শেষ পর্যন্ত নির্মলেন্দু বলেছিল, 'বাবা, আপনিই কেন আমার ওখানে গিয়ে থাকবেন চলুন না মাদ্রাজে!' কিন্তু তাতেও সুধাকান্ত রাজি নন। দেশ ঘর ছেড়ে অত দূরে এই বয়সে তিনি যাবেন না। ফলে পিতা, পুত্র আর পুত্রবধূর মধ্যে একটা মন-কষাকষির সূত্রপাত হল।

হেবো বাধা দিয়ে বলে, 'কিন্তু এর মধ্যে কাকিমার বিপদটা কোথায়?'

প্রবীরবাবু বলেন, 'বলছি, সবটা শোন আগে।'

ঘটনার গতিটা কোন দিক নিয়েছে এবার তিনি তা বুঝিয়ে দেন।

মাসচারেক আগে হঠাৎ একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় নির্মলেন্দু মারা গেলেন। এ আঘাতে সুধাকান্ত একেবারে ভেঙে পড়েছেন। তিনি যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। অথচ তাঁর মাথা খারাপের কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। মানসিক স্থৈর্য তাঁর ঠিকই বজায় আছে। তবে, সমস্ত দুনিয়ার উপর তাঁর একটা বিতৃষ্ণা জন্মেছে। সুধাকান্তের অর্থের অভাব ছিল না—যথেষ্ট টাকা উপার্জন করেছেন তিনি সারা জীবনে। তবু সেই টাকা রোজগারের অছিলাতেই ছেলে যে বাপকে ত্যাগ করে গিয়েছিল এটা তিনি ভুলতে পারেননি। ছেলে নেই—টাকার উপরেই মর্মান্তিক চটে গেছেন তিনি। তাঁর ধারণা হয়েছে 'অর্থই সকল অনর্থের মূল'। আর চটে গেছেন তাঁর পুত্রবধূর উপর। আগে থেকেই অবশ্য চটে ছিলেন, পুত্রের মৃত্যুর পর সেটা মর্মান্তিক আকার ধারণ করেছে।

মঞ্জুলার একটি সন্তান হয়েছিল ইতিমধ্যে। বছর-খানেকের ছেলেটিকে নিয়ে সে এসে আশ্রয় চাইল শ্বশুরের ভিটায়। আশ্রয় তিনি দিলেন, অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাও করতে তিনি রাজি; কিন্তু না পুত্রবধূ না তার অবোধ শিশুসন্তান—কাউকেই তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করলেন না।

দ্বিতল বাড়ি। উপর তলায় তিনখানি ঘর। একটি ঘরে থাকেন সুধাকান্ত বাবু, দ্বিতীয় ঘরটি তালাবন্ধ থাকে। সেটায় ছাত্রজীবনে নির্মলেন্দু থাকত। কখনও সখনও দেশে এলে সস্ত্রীক এই ঘরেই উঠত সে। তৃতীয় ঘরখানিতে বর্তমানে আছেন সুধাকান্তের গুরুদেব। মন্ত্রদীক্ষা দিতে তিনি এসেছিলেন একদিন, আর ফিরে যাওয়া হয়নি। একতলায় রান্না, ভাঁড়ার, বৈঠকখানা ছাড়াও আর একটি বাড়তি ঘর ছিল। সেটাতেই থাকতে দেওয়া হয়েছিল মঞ্জুলাকে। ঘরটা অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। এমন একখানা ঘরে তাকে থাকতে দেওয়ার সঙ্গত কারণ দেখিয়েছিলেন গুরুদেব। সুধাকান্ত নাকি পুত্রবধূর বৈধব্যের বেশটা সহ্য করতে পারেন না। না পারাই স্বাভাবিক। মাত্র পাঁচ বছর আগে যাকে আদর করে নিয়ে এসেছিলেন

এ বাড়ির লক্ষ্মী করে, সে-ই যদি আজ সাদা থান পরে তাঁর সামনে ঘুরে বেড়ায় তাহলে তাঁর কষ্ট হয় বইকি। মঞ্জুলাও তাই মেনে নিল এই দুর্ভাগ্যকে। একতলার ঐ অন্ধ কুটুরিতেই আশ্রয় নিল সে, শিশুসন্তানটিকে নিয়ে। বাড়িতে দারোয়ান, ঠাকুর আর পুরনো আমলের ঝি মোক্ষদামাসি আছে। তারাই সব কাজকর্ম সারে। গুরুদেব প্রথম দিনেই বলে দিয়েছিলেন, এ বেশে যেন মঞ্জুলা তার শ্বশুরের সামনে না যায়।

প্রথমটা লজ্জায় সঙ্কোচে আর হতাশায় মাথা নিচু করে এ আদেশ মেনে নিয়েছিল মঞ্জুলা। সুধাকান্তের পুত্রবিয়োগের জন্য যেন সে-ই দায়ী। সত্যই তো, এ বেশে সে কেমন করে গিয়ে দাঁড়াবে তাঁর সামনে? কিন্তু দু-দশদিন পরে তার খেয়াল হল—কিন্তু এ তো হতে পারে না! এই বেশ বদলাবার কোন সম্ভাবনা যখন নেই তখন সে কি চিরকালই ঐ অন্ধ কুটুরিতে পড়ে থাকবে নাকি? শ্বশুরের সেবাযত্ন করবে না?

গুরুদেব কঠিন হয়ে বললেন, 'না! এতদিন যদি পুত্রবধূর সেবা যত্ন ছাড়াই চলে গিয়ে থাকে তবে আর কটা দিনও চলবে!'

বাধ্য হয়ে এই অপমানকর জীবনযাত্রাকে স্বীকার করে নিয়েছিল মঞ্জুলা। নির্বান্ধব পুরীতে একতলার ঐ অন্ধকার ঘরে ইঁদুর আর আরশোলা তাড়িয়ে পড়ে ছিল কোনক্রমে। সদ্য-বিধবার যেন নূতন কোন কষ্টের বোধই ছিল না। তবু তার মনে একটি আশার বীজ সে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছিল—একদিন না একদিন সুধাকান্ত তাকে ক্ষমা করে কাছে টেনে নেবেন। কতদিন আর অভিমান করে থাকতে পারবেন তিনি? সুধাকান্ত কি কোনদিনই বুঝবেন না—যে-দুঃখের আগুনে তিনি জ্বলে পুড়ে মরছেন সেই একই আগুনে জ্বলছে এ বাড়ির আর একটি উপেক্ষিতা নারী? তাকে না হলেও অন্তত নির্মলেন্দুর সন্তানটিকে, ফুলের মত সুন্দর বংশের শেষ প্রদীপটিকে একদিন তিনি তাঁর পাঁজর-সর্বস্ব হাহা-করা বুকে টেনে নেবেনই। খোকন নূতন হাঁটতে শিখেছে। টলমল করে সারা বাড়ি টলে টলে বেড়ায়। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চায় দ্বিতলে।

কিন্তু তা হবার নয়। গুরুদেব আর তাঁর চেলাটি পালা করে পাহারা দেয় সুধাকান্তের ঘরের সামনে। ওঁদের ভয়ে খোকনকে উপরে নিয়ে যেতে পারে না কেউ। ক্রমে মঞ্জুলার আশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে, আর সে অনুভব করেছে যে শ্বশুরের সঙ্গে পুনর্মিলনের পথে একমাত্র বাধা হচ্ছেন ঐ গুরুদেবটি।

কিন্তু কেন? মঞ্জুলা কোন কারণ খুঁজে পায়নি।

মঞ্জুলার বাপের বাড়ির অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ভাই নেই তার। বাবা গত হয়েছেন। মা আছেন মালদায়—জমিজমা থেকে কোনক্রমে দিন চলে যায় তাঁর। একই দিদি—তিনিই হেবোর কাকিমা। হেবোর কাকা অবশ্য মঞ্জুলাকে তাদের বাড়িতে এনে রাখতে পারতেন; কিন্তু তাহলে শ্বশুরের বিষয় সম্পত্তি কিছুই সে পাবে না। ছেলেটিকেও তো মানুষ করে তুলতে হবে।

মঞ্জুলার চিঠি পেয়ে হেবোর কাকা আর কাকিমা কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুধাকান্তবাবু তাঁদের কোন আমলই দেননি। প্রথমত তিনি দেখাই করতে চাননি, বলে পাঠিয়েছিলেন—'আপনারা বৌমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি নিচের তলায় আছেন।' কিন্তু হেবোর কাকা নাছোড়বান্দা হয়ে দেখা করেছেন তাঁর সঙ্গে। সুধাকান্তবাবু ভালভাবে ওঁদের সঙ্গে কথাই বলেননি। তবু নকুলবাবু মধ্যস্থতায় মোটামুটি সাক্ষাতটা হয়েছে।

বাধা দিয়ে হেবো বলে, 'নকুলবাবুটি কে?'

হেবোর কাকিমা বলেন, 'নকুলবাবু হচ্ছেন তায়ইমশায়ের পুরানো মুহুরি। বলতে গেলে ওঁদের সংসারেরই একজন। তাঁরও সত্তরের কাছাকাছি বয়স। তিনি নির্মলেন্দুকে কোলো পিঠে করে মানুষ করেছেন। নির্মলেন্দুকে তিনিও খুব ভালবাসেন। সেই নিবন্ধব পুরীতে ঐ নকুলচন্দ্রই মঞ্জুলার একমাত্র ভরসা। খোকনের মধ্যে তিনি নির্মলকে যেন নূতন করে আবিষ্কার করেছেন।'

হেবো বলে, 'যাই হোক, তারপর?'

হেবোর কাকা বলেন, 'আসল সমস্যা হচ্ছে এই যে, আমরা জানি না সুধাকান্তবাবু কোন উইল করে রেখেছেন কি না। করলেও হয়ত তিনি নির্মলের নামে সবকিছু লিখে দিয়ে গেছেন।'

বাধা দিয়ে হেবো আবার বলে, 'আমি আইনের ব্যাপারটা ঠিক জানি না। যদি তাই করে থাকেন, তাহলে নির্মলবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী-পুত্রই কি সে সম্পত্তি পাবে?'

'হ্যাঁ, তাই পাবে।' বলেন প্রবীরকাকু, কিন্তু তোমার কাকা আশঙ্কা করছেন যে, ঐ গুরুদেবের পরামর্শে সুধাকান্তবাবু নূতন করে উইল করতে চাইছেন। আর সেই নূতন উইলে তিনি মঞ্জুলা দেবীকে আর তাঁর নাবালক সন্তানকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে চান।'

হেবো বলে, 'এ তো খুব সর্বনাশের কথা! এ কথা কি আপনাদের অনুমান, না প্রমাণ আছে কিছু?'

প্রবীরবাবু বলেন,'এটা এখনও অনুমানের পর্যায়েই আছে বটে তবে অনুমানের স্বপক্ষে যথেষ্ট জোরালো যুক্তিও আছে। খবরটা দিয়েছেন নকুলচন্দ্র।'

সে কাহিনীও বিস্তারিত শুনল হেবো।

সুধাকান্তবাবুকে এই পুরাতন ভক্তটি আজও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। নকুলচন্দ্র ছিলেন তাঁর মুহুরি। সুধাকান্তের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে দু হাতে পয়সা কামিয়েছেন—ছেলেদের মানুষ করেছেন, মেয়েদের পাত্রস্থ করেছেন। দু-জনেই অবসর নিয়েছেন বটে, তবু আজও নকুলচন্দ্র প্রতিদিন আসেন তাঁর 'বড়বাবুকে' দেখতে। সংসারের খবরাখবর নিয়ে, পুরাতন দিনের কথা দুটো-চারটে আলোচনা করে, রাত বাড়লে বাড়ি ফিরতেন। সুধাকান্ত কোন্ কেসে কেমন করে সওয়াল করেছিলেন, কোন্ আসামীকে ফাঁসির দড়ির নিশ্চিত আলিঙ্গন

থেকে মুক্ত করেছিলেন, কোন্ ধড়িবাজ বদমায়েসের কূট-কৌশল ব্যর্থ করে তাকে কারাকক্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন—বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতেন নকুলচন্দ্র। আর মনে মনে খুব উপভোগ করলেও সুধাকান্ত বলতেন, 'আরে ছেড়ে দাও নকুল! ওসব কথা থাক, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। আমাদের সময় হাকিমরা ছিল সত্যিকারের মানুষ। সেই ম্যাকফার্লন সাহেবকে মনে আছে তোমার?'

নকুল বলতেন, 'মনে নেই আবার? ফেয়ারওয়েলের দিন তিনিই না আপনাকে বলেছিলেন, এখান থেকে যেতে আর কোন দুঃখ নেই, শুধু একটা দুঃখ, তোমার মত উকিলের জোরালো সওয়াল আর শুনতে পাব না।'

বাধা দিয়ে সুধাকান্ত বলতেন, 'আরে ছেড়ে দাও নকুল! ওসব কথায় আর কাজ কী?'

এই দুটি প্রাচীন বন্ধুর সামাজিক মর্যাদার আসন উঁচু নিচু কি না বুঝবার উপায় ছিল না। ওঁদের বন্ধুত্বে ভাঁটার টান পড়ল সুধাকান্ত দীক্ষা নেবার পর থেকে। গুরুদেব নকুলচন্দ্রকে পছন্দ করতেন না। ওঁদের সান্ধ্য আসরে প্রায়ই এসে বসতেন তিনি। আর দু-জনেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়তেন ক্রমশ নকুলচন্দ্র অনুভব করেন, তিনি এ বাড়ির কর্তার কাছে অবাঞ্ছিত। তবু দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অভ্যাসবশত সন্ধ্যাবেলায় একবার দেখা দিয়ে যেতেন।

কিছুদিন আগে সুধাকান্তের হঠাৎ খুব জ্বর হয়। নকুলচন্দ্র তৎক্ষণাৎ খবর পাঠালেন শহরের নামকরা ডাক্তার অনুকূলবাবুকে। অনুকূলচন্দ্র বয়সে ছোট, কিন্তু পসার খুব আছে তাঁর। ঔষধপত্র পড়তে সামলে নিলেন সুধাকান্ত, কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি। দিন সাতেক জ্বর ভোগ করেই একেবারে কাবু হয়ে পড়লেন। বিছানা থেকে নামতে পারেন না। হার্টের অবস্থা ভাল নয়। শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন সুধাকান্ত। নকুলচন্দ্র সকাল—বিকেল দু-বেলা আসতে শুরু করলেন, খবর নিতে—ব্যবস্থা-পত্র করতে। বয়স হলে কী হবে, নকুলচন্দ্র এখনও বেশ শক্ত আছেন। দোতলায় উঠে গিয়ে তিনি তাঁর বড়বাবুর সঙ্গে রোজ দেখা করেন। সেদিনও গিয়ে যেই বসেছেন, সুধাকান্ত বললেন, 'নকুল, ঐ লোহার সিন্ধুকটা খুলে ডানদিকের উপরের খোপে একটা বন্ধ খাম আছে, বার করে দাও তো।'

দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা লোহার মজবুত আলমারি। তার চাবিটা সর্বক্ষণ থাকে অসুস্থ সুধাকান্তের বালিশের নিচে। চাবিটা বার করে তিনি নকুলচন্দ্রের হাতে দিলেন। ওঁর চোখের সামনেই ঘটছে সব কিছু। নকুলচন্দ্র চাবি খুলে উপরের খোপ থেকে একটা সীলমোহর-করা খাম বার করে ফিরে এলেন। খাম ও চাবিটা বড়বাবুর হাতে দিতে সুধাকান্ত বললেন, 'সিন্ধুকটা আবার খোলা রেখে এলে কেন? ওটা বন্ধ করে চাবিটা দাও আমাকে।'

নকুলচন্দ্র বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম, খামটা আবার তুলে রাখতে হবে।'

'না, ওটা এখন বাইরেই থাকবে।'

খামটা বালিশের নিচে রাখলেন সুধাকান্ত।

সিন্দুক বন্ধ করে নকুলচন্দ্র চাবিটা তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেবার সময় আর আত্মসংবরণ করতে পারেন না, বলে ফেলেন, 'কিন্তু এটা কি ভাল হচ্ছে বড়বাবু?'

চমকে উঠে সুধাকান্ত বললেন, 'কোনটা' নকুল?

'আমি তো স্যার জানি কী আছে ঐ সীলমোহর-করা খামের ভিতরে! বছর-দশেক আগে ওটা আমিই তো আপনার সামনে সীলমোহর করেছিলাম। সাক্ষী হিসাবে আমারও সই আছে কাগজটায়।'

সুধাকান্ত কোন জবাব দিলেন না। গুম মেরে বসে রইলেন। কিন্তু নকুলচন্দ্র পাকা লোক। সাক্ষী নীরব থাকলে তাকে ছেড়ে দিতে নেই, আরও ভাল করে চেপে ধরতে হয়—দীর্ঘদিনের কোর্ট-কাছারির অভিজ্ঞতায় এটুকু জানা ছিল তাঁর। তাই হেসে বলেন, 'আপনি আমার কথার জবাব দিলেন না কিন্তু, বড়বাবু।'

সুধাকান্ত ধমকে উঠেন, 'উইল পালটাব কিনা তাও কি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে নাকি?'

নকুল ম্লান হাসেন। অনেক দুঃখের সে হাসি। বলেন, 'আজ্ঞে না। আপনি মস্ত বড় উকিল, আর আমি সামান্য মুহুরি। আপনারই অন্নে প্রতিপালিত বলতে পারেন। আমার মতো সামান্য লোকের সঙ্গে আপনি কেন এসব বৈষয়িক ব্যাপারে পরামর্শ করবেন? তবে কিনা নিমুকে একদিন কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলাম—তাই তার ঐ বাচ্চাটার কথা ভেবে—কিন্তু নাঃ! আমার অন্যায়ই হয়েছে।'

পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে থাকেন সুধাকান্ত।

নকুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'আর মুশকিল হয়েছে কি জানেন বড়বাবু—আপনি তো চোখে দেখেন না, ওদের উপরেই আসতে দেন না; কিন্তু আমি তো দেখতে পাই, খোকনবাবু সারাটা বাড়ি টলমল করে হেঁটে বেড়ায়। ঠিক নিমুর মত দৃষ্টি হয়েছে—মায় হাসিটা পর্যন্ত। তাই ঐ ছেলেটির ভবিষ্যৎ ভেবে . . . কিন্তু আবার পাগলামি করছি আমি। এ সব কথা আলোচনা করার আমার অধিকারই যে নেই! হ্যাঁ, অন্যায়ই হয়েছে আমার, মাপ করবেন আমাকে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান নকুলচন্দ্র। লাঠিটা তুলে নেন হাতে।

আশ্চর্য, তবু সুধাকান্ত কোন প্রতিবাদ করেন না। জানলা দিয়ে দূর দিগন্তের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে থাকেন পাথরের মূর্তির মতো। তিনি যেন ভুলে গেছেন দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে নকুলচন্দ্রের সঙ্গে এ বাড়ির কী সম্পর্ক! প্র্যাকটিসের প্রথম অবস্থা থেকেই তিনি টাকার মুখ দেখেননি। প্রথম যৌবনে তিনিও যেমন গুনতেন কোর্টঘরের কড়ি ও বরগা, মুহুরিবাবুও তেমনি সারাদিন ধরে গুনতেন বটগাছের পাতা। সেই দুঃখের দিন থেকেই নকুলচন্দ্র তাঁর বড়বাবুর সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়েছিলেন—সুখে দুঃখে শতাব্দীর অর্ধাংশ পাড়ি দিয়ে এসেছেন একই নৌকোয়। নিমুর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতে ঐ

নকুলচন্দ্রকেই একদিন পাঠিয়েছিলেন। বিয়ের দিন বরযাত্রী যেতে পারেননি--একটা বড় কেসের দিন পাল্টানো যায়নি বলে—ঐ নকুলচন্দ্রকেই বরকর্তা করে পাঠিয়েছিলেন। বৈবাহিককে বলে পাঠিয়েছিলেন—'আমি নগদ চাই না, নমস্কারি চাই না, ননদ পুঁটুলি চাই না—নির্মলের কাকাকে যেন বৌমা গরদের পাঞ্জাবি আর ধুতি দিয়ে প্রণাম করেন।' মঞ্জুলার মা একই গরদের থান থেকে কেটে দু-জোড়া পাঞ্জাবি বানিয়েছিলেন—মঞ্জুলার শ্বশুরের ও খুড়াশ্বশুরের নমস্কারি। সেসব দিনের কথা আজ সুধাকান্ত নিঃসংশয়ে ভুলে গেছেন।

নকুলচন্দ্র ধীর পায়ে বেরিয়ে যেতে চান ঘর থেকে। সুধাকান্ত ফিরে ডাকেন না তাঁকে। দরজার কাছে গিয়ে নকুলচন্দ্র দেখেন, দাঁড়িয়ে আছেন সুধাকান্তের গুরুদেব। পরনে লাল চেলি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালার উপর গরদের চাদর, কপালে আধুলির মাপে একটা সিঁদুরের টিপ। তন্ত্রসাধক তিনি। কেউ-কেউ বলে তিনি নাকি কাপালিক। চোখদুটো আগুনের ভাঁটার মতো সর্বক্ষণ জ্বলে। বয়সে ঐ গুরুদেবটি সুধাকান্তের চেয়ে বছর-বিশেক ছোটই হবেন—পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স তাঁর—তবু তিনি অনায়াসে সুধাকান্তের প্রণাম নিয়ে থাকেন।

নকুলচন্দ্র গুরুদেবকে নমস্কারমাত্র না করে বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় শুনতে পান গুরুদেব তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বেশ জোর গলায় সুধাকান্তকে বলছেন—'আবার তুমি ঐসব অসৎ কুসঙ্গের সংস্পর্শ করছ? বলেছি না— ওদের দোতলায় উঠতে দেবে না!'

মিনমিনে গলায় সুধাকান্ত কী জবাব দিলেন সেটা আর শুনতে পেলেন না তিনি।

এতক্ষণ তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়ে হেবো শুনছিল কেস-হিস্ট্রিটা। প্রবীরচন্দ্র থামতেই বলল, 'বুঝলাম। এখন কী করতে চান আপনারা?'

কাকা বলেন, 'আমি তো আশার কোনও চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না।'

বাধা দিয়ে হেবো বলে, 'কেন? এখনই নিরাশ হবার কী আছে? আমি তো আশার লক্ষণ ভালই দেখতে পাচ্ছি। প্রথমত দেখুন, সুধাকান্ত গুরুদেবের হাতে সিন্ধুকের চাবিটা দেননি। নিজে উত্থানশক্তি-রহিত, কিন্তু সিন্ধুক খোলার কাজটার জন্য সাহায্য নিয়েছিলেন নকুলবাবুর। দ্বিতীয়ত, নকুলচন্দ্র যখন খোকনের কথা বলছিলেন, তখন তিনি উদাস দৃষ্টি মেলে জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তৃতীয়ত, বোঝা যাচ্ছে গুরুদেব ইতিপূর্বেই নকুলচন্দ্রের দ্বিতলে আসা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু সে নিষেধ অমান্য করেছিলেন সুধাকান্ত।'

কাকা বলেন, 'কি জানি বাপু, অত সূক্ষ্ম বিচার আমি বুঝি না। আমি প্রবীরকে বলছিলুম কাজটা হাতে নিতে। এ সাধারণ মানুষের কাজ নয়। পুলিসের সাহায্যও আমরা পাব না, কারণ সুধাকান্ত বে-আইনি কিছু করছেন না। সম্পত্তি সুধাকান্তের নিজের উপার্জন, পৈতৃক নয়। তিনি যদি সজ্ঞানে ও স্ব-ইচ্ছায় তাঁর স্বোপার্জিত সম্পত্তি গুরুদেবকে উইল করে দিয়ে

যান,তাহলে আইনত আমাদের আপত্তি করবার কিছু নেই। মামলা-মোকদ্দমা করে মঞ্জুলা হয়ত তার নাবালক সন্তানের জন্য একটা মোটামুটি খোরপোষ আদায় করতে পারবে--তাও পারবে কিনা জানি না। কিন্তু এত বড় অন্যায়টা সহ্যই বা করে যাওয়া যায় কেমন করে?'

হেবো বলে, 'সে তো ঠিক কথাই। সুধাকান্তকে বাধা দেবার আইনগত অধিকার না থাকলেও নীতিগত অধিকার আমাদের আছে। এ যদি অধর্ম না হয়, তবে অধর্ম আর কাকে বলে? কিন্তু প্রবীরকাকু, কেমন করে কী করবেন?'

কাকা বলেন, 'তা যদি আমি বাতলাতে পারব তাহলে আমিই তো গোয়েন্দা হতুম।'

হেবো গম্ভীর হয়ে বলল, 'সে কথা ঠিক। তা প্রবীরকাকু, আপনি কী বলছেন?'

'আমি বলছি, আমাদের কিছু করতে হলে সর্বপ্রথম ঐ দুর্গের ভিতর ঢুকতে হবে। আমার পক্ষে ঐ ব্যূহে প্রবেশ করা অসম্ভব। গুরুদেবটিকে আমি চিনি। গভীর জলের মাছ তিনি। বহু বিধবার সম্পত্তি গ্রাস করেছেন আশ্রমের নামে। তাছাড়া চোরাই মাল পাচারের একটা ফলাও ব্যবসা তার আছে। বহুবার ফাঁদ পেতেছে পুলিস—ধরা পড়েনি একবারও। অত্যন্ত ধড়িবাজ লোক। সেও আমাকে চেনে, আমিও তাকে চিনি। ফলে কোন ছুতো-নাতাতেই আমার পক্ষে ঐ ব্যূহে প্রবেশ অসম্ভব।'

হেবো বলে, 'বুঝেছি। ভীমসেনও ঠিক ঐ কথাই বলেছিলেন।'

'ভীমসেন কে?'

'মধ্যম পাণ্ডব। দ্রোণাচার্যের চক্রব্যূহ ভেদ করতে পারেননি তিনি। শেষ-মেশ আমারই মত একটা বাচ্চা ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন—তুই ঢোক ওর ভিতর।'

কাকিমা ভয় পেয়ে বলেন, 'না বাপু, এ সবের মধ্যে হেবোর গিয়ে কাজ নেই। বড়ঠাকুরও বাড়িতে নেই—'

বাধা দিয়ে হেবো বলে, 'ভয় নেই কাকিমা, অভিমন্যু-বধ পালা অভিনয় করছি না আমরা। বেরিয়ে আমি ঠিকই আসব।'

প্রবীরও আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'তাছাড়া আমি তো থাকবই পিছনে।'

হেবো হেসে বলে, 'সেটা কোন সান্ত্বনার কথা নয় প্রবীরকাকু, কারণ ভীমসেনও অভিমন্যুকে ঐরকম একটা প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বলছি, কাজটা টেক আপ করতে পারতুম, সামনে ছুটিও আছে স্কুলের—ক্লাস কামাই হবে না; কিন্তু আমি ওখানে যাব কোন অছিলায়?

প্রবীরবাবু বলেন, 'আমি সেটা আগেই ভেবে রেখেছি। নকুলবাবু আমাদের দলে। তিনি সুধাকান্তবাবুকে বলবেন, তুমি তার ভাইপো বা ভাগ্নে। গাঁয়ে থাক—দুদিনের জন্য শহর দেখতে এসেছ।'

হেবো বলে, 'তাতে দুটি অসুবিধা। প্রথম কথা, নকুলবাবু সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না,

অথচ সুধাকান্তবাবু আজ পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁকে চেনেন। জেরার মুখে আমি ধরা পড়ে যেতে পারি। মনে করুন, নকুলচন্দ্রের এক ছেলে পাঁচ বছর আগে সাপের কামড়ে মারা গেছে। তাঁর ভাইপোর পক্ষে এত বড় খবরটা জানা থাকা উচিত। সেই প্রসঙ্গ উঠলে আমি কী বলব? দ্বিতীয়ত, নকুলবাবুর বাড়িও কৃষ্ণনগরে—তাঁর ভাইপো বা ভাগ্নে গ্রাম থেকে শহর দেখতে এলে তাঁর বাড়িতেই উঠবে। সুধাকান্তের স্কন্ধে তাকে নকুলচন্দ্র চাপাতে চাইবেনই বা কেন, আর তাঁর ভাইপোই বা ভাইবোনদের ছেড়ে ঐ নির্বান্ধব পুরীতে থাকতে চাইবে কেন?'

কাকা বলেন, 'এ কথা ঠিক।'

হেবো বলে, 'তার চেয়ে আমার মাথায় আর একটা ফন্দি এসেছে। আচ্ছা, নকুলবাবুর বাড়িতে কে কে আছেন?'

কাকিমা বললেন, 'ঠিক জানি না। তবে ওঁর অনেকগুলো ছেলে মেয়ে নাতি-নাতনি আছে শুনেছি।'

হেবো বলে, 'ব্যাস্ ব্যাস্, মা ষষ্ঠী রক্ষা করেছেন। বসুন, আসছি আমি—উপায় বার করেছি।'

বলেই বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। একটু পরে ফিরে আসে একখণ্ড টেস্ট পেপার নিয়ে। পাতা উল্টে কী দেখে নিয়ে বলে, 'নকুলবাবু বলুন, আমার বাবা তাঁর পরিচিত একজন

মক্কেল। মামলা-সূত্রে আলাপ। আমি হাঁসখালি উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের একটি ছাত্র। এবার হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দেব। আমার সীট পড়েছে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে। পরীক্ষা দিতে শহরে এসেছি। যেহেতু নকুলবাবুর বাড়িতে মা ষষ্ঠীর কৃপায় সারাদিন চ্যাঁ-ভ্যাঁ লেগে আছে, তাই তিনি আমাকে কয়েকদিনের জন্য সুধাকান্তবাবুর বাড়িতে এনে রাখছেন। দ্বিতলের অব্যবহৃত ঘরটায় থেকে আমি পড়শুনা করব ও পরীক্ষা দেব। ব্যাপারটা বুঝেছেন? আমি তাহলে দোতলাতেই থাকব। সকাল বেলা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে যাব, তারপর লুকিয়ে থাকব বাড়িতেই। যেহেতু আমি পরীক্ষার্থী তাই কেউ সন্দেহ করবে না যে, পরীক্ষা না দিয়ে আমি বাড়িতেই লুকিয়ে আছি।'

যে কথা সেই কাজ। পরদিন সকালের লালগোলাঘাট প্যাসেঞ্জারে নকুল ও প্রবীরচন্দ্রের সঙ্গে হেবো রওনা দিল কৃষ্ণনগর। হেবোর বাবা-মা কদিনের জন্য মধুপুরে গেছেন ঈস্টারের ছুটিতে। হেবোরও স্কুল ছুটি; ঈস্টার, মহরম আর হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার জন্য লম্বা ছুটি। মেজদা একবার হেবোকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে কোথায় যাচ্ছে। হেবো জবাবে বললে, 'কাকা যেখানে পাঠাচ্ছেন।'

নকুলচন্দ্র হেবোকে নিয়ে এলেন সুধাকান্তের বাড়িতে। ঠিক হল প্রবীরচন্দ্র কাছে-পিঠেই কোন একটা বোর্ডিং হাউসে থাকবেন। রোজ সন্ধ্যাবেলা হেবো গিয়ে তাঁকে দৈনন্দিন রিপোর্ট দেবে। সুধাকান্ত নকুলবাবুর পরিচিত এই ছেলেটিকে কদিনের জন্য তাঁর বাড়িতে রাখতে রাজি হলেন। ব্যূহ প্রবেশে কোন বেগ পেতে হল না। হেবোর আসল পরিচয়টা নকুলচন্দ্র শুধু জানিয়ে গেলেন মঞ্জুলা দেবীকে। প্রয়োজন ছিল না, কারণ দিদির কাছ থেকে হেবোর কীর্তি-কলাপ ইতিপূর্বেই শুনেছিলেন তিনি। তবু মঞ্জুলা দেবী খুব যে একটা ভরসা পেলেন তা তাঁর মুখ দেখে মনে হল না।

সুধাকান্তবাবু হেবোকে ডেকে কোন প্রশ্ন করলেন না। এসব দিকে যেন তাঁর খেয়ালই নেই। হেবো লক্ষ্য করে দেখে, তাঁর ঘরের সামনে সর্বক্ষণ একটা টিকিওয়ালা লোক বসে পাহারা দেয়। শুনল, লোকটা গুরুদেবের এক চ্যালা—নাম কেবলানন্দ।

ঘরটার তালা খুলে যে ওকে পৌঁছে দিয়ে গেল সে বাড়ির ঠাকুর। হেবো তার স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখে নেয়। দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটা চওড়া বারান্দা, ডানদিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকে দুখানি ঘর। আর সিঁড়ির বাঁয়ে পশ্চিম দিকে আর একখানা কামরা। পূর্বদিকের প্রথম ঘরখানা এতদিন তালাবন্ধ পড়ে ছিল। পাশের ঘরখানিতে আছেন অসুস্থ গৃহকর্তা। সিঁড়ির ওপাশের পশ্চিমের ঘরখানায় গুরুদেব তাঁর সেই চেলাটিকে নিয়ে থানা গেড়েছেন। অর্থাৎ ঐ পশ্চিমদিকের ঘরখানাই হচ্ছে শত্রুপক্ষের শিবির।

হেবো খুশি হয় মনে মনে। এতে তার সুবিধাই হয়েছে। ঠিক পাশের ঘরেই আছেন সুধাকান্ত। দুটি ঘরের মাঝখানে আছে একটি দরজা, ওপাশ থেকে বন্ধ। দরজার গায়ে বিলাতি বাড়ির কায়দায় গা-তালা লাগানো। গা-তালায় চাবির যে ফুটো আছে তাতে চোখ

লাগালে ও-পাশের ঘরের খানিকটা নজরে আসে—খাটের একটু অংশ। লোহার সিন্দুকটা অবশ্য দেখা যায় না। সেটা ঘরের অন্য প্রান্তে। হেবো মনে মনে স্থির করল—প্রথমেই তাকে একখণ্ড সাদা কাঁচ যোগাড় করতে হবে। ঐ ছিদ্রপথে তাকে বারে বারে চোখ লাগাতে হবে; আর গুরুদেবটি যে রকম ঝাণ্টু লোক, তাক বুঝে কাঠির খোঁচা মেরে হেবোকে কানা করে দিতে পারেন। একতলায় যে ঘরটায় মঞ্জুলা দেবী থাকেন সেটাও দেখল। সেটাও অব্যবহৃত হয়ে পড়ে ছিল দীর্ঘদিন। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে খসে পড়েছে।

ঠাকুর, দারোয়ান, ঝি—সকলকেই লক্ষ্য করে দেখল। মনে হল না ওরা কোনও পক্ষে যোগ দিয়েছে। অন্তত ও-পক্ষে যে নয় সেটা বোঝা যায়, কারণ দেখা যাচ্ছে সবাই খোকনকে ভালবেসে ফেলেছে এবং সবাই গুরুদেবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। এগুলো শুভ লক্ষণ, ওরা বোধহয় বেইমানি করবে না। অবস্থা বেগতিক হলে ওরা এ-পক্ষেই যোগ দেবে। গুরুদেবটিকেও ভাল করে লক্ষ্য করল। কাপালিক বা তান্ত্রিকদের মত দেখতে নয় মোটেই। প্রকাণ্ড তাঁর বপুখানি, মেদের মৈনাক! মাথায় কাঁচা-পাকা বাবরি চুল। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। পেল্লায় একটি ভুঁড়ি, কপালে সব সময়েই একটা লাল সিঁদুরের টিপ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তান্ত্রিক বলতেই যেমন বাজে-পোড়া তালগাছের মত পাকানো চেহারার কথা মনে পড়ে, এঁকে দেখে তা মনে পড়ে না মোটেই—বরং মনে হয় কৃষ্ণনগরের আহ্লাদি-পেহ্লাদি পুতুলের একজন জোড়া ভেঙে এসেছে বুঝি। মেদবহুল ঐ চেহারার মধ্যে দেখবার মত বস্তু হচ্ছে তাঁর চোখদুটো। প্রায় সব সময়েই ফুলো-ফুলো, গালের চর্বির তলায় ঢাকা থাকে, কিন্তু সময়,-বিশেষে জ্বলে ওঠে।

প্রথম দর্শনেই হেবোর উপর যেন তাঁর স্নেহের সমুদ্র উথলে উঠল। হেবো ছদ্ম-ভক্তিভরে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল বলেই বোধহয়। গুরুদেব বললেন, 'কল্যাণ হোক! তোমার নামটি কী বাবা?'

'আজ্ঞে ভাল নাম— বটুকনাথ বটব্যাল, ডাক নাম বটু।'

'ভাল, ভাল। তা বাবা বটু, তুমি বুঝি হাঁসখালি ইস্কুলের ছাত্র? সায়েন্স, না হিউম্যানিটিজ?'

'আজ্ঞে সায়েন্স।'

'খুব ভাল। এটা তো সায়েন্সেরই যুগ! আচ্ছা এস তুমি। মন দিয়ে পড়াশুনা কর।'

গুরুদেবের চেলাটি হাবাগোবা ধরনের; কিন্তু বুদ্ধিতে কম হলে কী হবে, লোকটার গায়ে অসুরের শক্তি, আর বুলডগের মত একরোখা। সম্ভবত লোকটা উৎকলবাসী। সুধাকান্তের দরজায় সমুখে থানা গেড়েবসে আছে যেন একটা ব্লাড-হাউণ্ড কুকুর! গুরুদেব ওকে ডাকেন, 'বাবা কেবল' বলে — নাম শোনা গেল কেবলানন্দ।

নিজের ঘরে এসে হেবো খুব আড়ম্বর করে তার বইপত্র সাজিয়ে রাখল টেবিলের উপর, আর পিছনের একটা কুলুঙ্গিতে লুকিয়ে রাখল তার গোয়েন্দাগিরির সরঞ্জাম—নোটবই, ডায়েরী, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, মাপবার ফিতে।

প্রথম দিনটা গেল পরিস্থিতিটা ঠিকমত আঁচ করে নিতে, এ নাটকের চরিত্রগুলিকে ভালমতো সমঝিয়ে নিতে। হেবো বুঝেছে—তার প্রথম, প্রধান ও একমাত্র কাজ হচ্ছে পাশের ঘরের উপর নজর রাখা। যতদূর জানা গেছে সুধাকান্ত তাঁর পুরাতন উইলটি লোহার সিন্দুক থেকে বার করেছেন, সেই উইল-মতে নির্মলেন্দুবাবুরই সমস্ত সম্পত্তি পাওয়ার কথা। যেহেতু নির্মলেন্দু গত হয়েছেন, সুতরাং আইনমতে নির্মলেন্দুর স্ত্রী মঞ্জুলা দেবী ও নাবালক পুত্র এখন সেই সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু ভাবগতিক দেখে অনুমান করা যেতে পারে, সুধাকান্ত উইলটি বার করে রেখেছেন সেটা পালটাবার জন্য। আগের উইলটি যদি তিনি নষ্ট করেন তাহলেও ভাবনার কিছু নেই, কারণ আইন বলছে যে, উইল না করে তিনি যদি মারা যান, তাহলেও মঞ্জুলা আর তাঁর সন্তান সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন না। কিন্তু দুর্ভাবনার শেষ তো সেখানেই নয়—সুধাকান্ত আবার যে নূতন উইল করতে চান। তিনি না চাইলেও গুরুদেবটি তাঁকে দিয়ে তাই করাতে চান। যে-কোন কারণেই হোক সুধাকান্ত এখন সম্পূর্ণভাবে ঐ গুরুদেবটির করতলগত। কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকাকে টেনে নিয়ে যায়, গুরুদেবও তেমনি অনিবার্যভাবে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন বৃদ্ধকে। সুধাকান্তের যেন ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা, শুভবুদ্ধি বলে কিছু নেই, তিনি হয়ে পড়েছেন কলের পুতুল। ফলে দু-চার দিনের মধ্যেই, অর্থাৎ সুধাকান্তের সই করার ক্ষমতা লুপ্ত হবার আগেই ঐ গুরুদেবটি তাঁকে দিয়ে উইলটি পালটিয়ে নিতে চান।

আচ্ছা, ইতিমধ্যেই সে দুষ্কর্মটি হয়ে যায়নি তো? হেবো অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত সমাধানে এসেছে—না! কারণ মঞ্জুলা দেবীর কাছ থেকে জানা গেছে, ইতিমধ্যে একমাত্র ডাক্তারবাবু ছাড়া বাইরের লোক কেউ আসেনি এ বাড়িতে। উইল পালটাতে হলে সাক্ষী চাই। গুরুদেব সাক্ষী হলে চলবে না। কেবলানন্দ সাক্ষী হলে সেটা খুব জোরদার হবে না। ডাক্তারবাবু যখন আসেন তখন ঠাকুর ব্যাগ হাতে ঘরে থাকে। ফলে উইলটা এখনও পালটানো হয়নি। সাক্ষীর অভাবই তার প্রমাণ। কলকাতা থেকে আসবার সময় নকুলচন্দ্রের কাছ থেকে হেবো আইনের ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝে নিয়েছে। নকুলচন্দ্র নামকরা উকিলের মুহুরি ছিলেন—আইন ভালরকমই জানেন তিনি। আইনঘটিত খিটিমিটিগুলো বুঝে নিয়েছে বলেই হেবো জানে, একটা জোরদার সাক্ষী না রেখে গুরুদেব উইলটা পালটাবার ব্যবস্থা করবেন না।

খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাবার আগে হেবো তার নোটবই বার করে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলি বিজ্ঞানসম্মতভাবে ছকে ফেলল :

নিম্নলিখিত উপায়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব :

১। নূতন উইল যদি সুধাকান্ত না করতে পারেন—

(ক) উইল লেখার আগেই সুধাকান্তের আকস্মিক মৃত্যু—

(তাহলে তাঁকে খুন করতে হয়—অসম্ভব!)

(খ) উইল লেখার আগেই সুধাকান্তের সই করবার ক্ষমতা লোপ—

(তা কেমন করে সম্ভব?)

২। নূতন উইল যদি আইনত সিদ্ধ না হয়—

(ক) যদি সাক্ষী না থাকে—

(গুরুদেবটি খলিফা ব্যক্তি—সাক্ষীর ব্যবস্থা তিনি করবেনই।)

(খ) সুধাকান্তের সই যদি না মেলে—

(অসম্ভব—যেহেতু তিনি সজ্ঞানে স্বইচ্ছায় সই করছেন।)

(গ) যদি আইনের অন্য কোন খুঁত থাকে—

(অসম্ভব—সুধাকান্ত আইনজ্ঞ লোক।)

(ঘ) যদি প্রমাণ করা যায় সুধাকান্তের মানসিক স্থৈর্য ছিল না—

(প্রায় অসম্ভব—কারণ তিনি যে পাগল নন তা সুপ্রতিষ্ঠিত।)

৩। নূতন উইল যদি গুরুদেব উপস্থাপিত করতে না পারেন—

(ক) গুরুদেব যদি মারা যান—

(তাহলেও লাভ নেই—গুরুদেবের ওয়ারিশ সম্পত্তি পাবে।)

(খ) উইল যদি হারিয়ে যায়—

(অসম্ভব—গুরুদেব ওটা সযত্নে রাখার ব্যবস্থা করবেন।)

(গ) উইল যদি চুরি যায়—

(একমাত্র সম্ভাবনা—গুরুদেবের সঙ্গে শার্লক হেবোর বুদ্ধির রণাঙ্গনে, দ্বৈরথ সমরের ফলাফলই এর জবাব দিতে পারে!)

যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার উপক্রম করছে, হঠাৎ মনে হল কে যেন তার দরজায় টোকা দিচ্ছে। টপ করে খাট থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে হেবো। কে ডাকছে তাকে? সন্তর্পণে দরজা খুলে দেখে অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে কেবলানন্দ।

'বাবা আপনাকে ডাকছেন।'

কেবলানন্দ গুরুদেবকে 'বাবা' ডাকে।

'উনি এখনও ঘুমোননি?'

'না, এখনও তাঁর সেবা হয়নি।'

সেবা হয়নি? কার সেবা হয়নি? কিসের সেবা হয়নি? হেবো কোন কথা বলে না। ওর পিছনে-পিছনে চলে আসে শত্রুশিবিরে—গুরুদেবের ঘরে। এতক্ষণে মালুম হয় 'সেবা' জিনিসটা কী। গুরুদেব নৈশ আহারে বসেছেন। কার্পেটের একটা বড় আসন বেমালুম হারিয়ে গেছে তাঁর বিশাল বপুর অন্তরালে। তাঁর সামনে একটা বড় পাথরের থালায় স্তূপাকার করা গব্য ঘিয়ে ভাজা লুচি। পাশে ম্যাগনাম সাইজ একটা জামবাটিতে

মাংস—থুড়ি! মহাপ্রসাদ। রুপার একটি মাঝারি বাটিতে দেড়পো আন্দাজ ঘন ক্ষীর, আর রেকাবিতে খান-আস্টেক সরপুরিয়া। আরও তিন-চারটে বাটিতে নানান ব্যঞ্জন। এই হচ্ছে বাবাজীর নৈশ 'সেবা'!

হেবো এবার আর ছদ্মভক্তিভরে নয়, সত্যিই ভক্তিভরে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। পঞ্চাশ বছর বয়সে যিনি এই পরিমাণ 'সেবা' উদরস্থ করবার সাহস রাখেন তিনি নমস্য বইকি!

গুরুদেব ওকে সামনের আসনে বসতে বললেন।

বলার প্রয়োজন ছিল না। লুচি-পিরামিডের সামনে সহাস্যবদন স্ফিংসকে দেখে এমনিতেই সে ধপ্ করে বসে পড়েছিল।

মধুর হেসে গুরুদেব বলেন, 'আহারাদি হয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

গুরুদেব হেবোর হাতে একটি নির্মাল্য দিয়ে বলেন, 'এই জবাফুলটি সব সময় কাছে কাছে রাখবে। ভয় নেই, ভালভাবেই পাশ করে যাবে তুমি। আর হ্যাঁ, রাত্রে শয়নের পূর্বে এক গ্লাস করে কমলালেবুর সরবত খাবে। রাত জেগে অধ্যয়ন করতে হচ্ছে তো! ওতে পিত্ত প্রকুপিত হতে পারে না।'

হেবো অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। চৈত্র মাসে কমলালেবু কোথায় পাবে প্রশ্ন করতেও ভুলে যায়।

গুরুদেব বলেন, 'বাবা কেবল, ওকে এক গ্লাস সরবত দাও।'

কেবলানন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে যায়। কুঁজো থেকে ঢেলে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল কাঁচের গ্লাসে করে হেবোর সামনে রাখে। ব্যাপারটা হেবো বুঝতে পারে না। ওর সেই অবাক চাহনি দেখে গুরুদেব হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, 'ওহো তাইতো, ওটা তো সাদা জল! দাও গ্লাসটা আমাকে।'

গুরুদেব নিজেই গ্লাসটা টেনে নেন। একটা গামছা দিয়ে সেটাকে ঢেকে দেন। তারপর সেই গামছার ভিতর ডান হাতটা ঢুকিয়ে জলটা স্পর্শ করেন। যেন কিছুই হয়নি। এবার গামছাটা সরিয়ে নিয়ে বলেন, 'নাও, এবার খাও!'

স্তম্ভিত হয়ে যায় হেবো। ওর সামনে একগ্লাস কমলা রঙের সরবত! কথা ফোটে না ওর মুখে। দু-এক মিনিট কেটে যাবার পর সম্বিৎ ফিরে পায় একটা অট্টাহাসি শুনে। শুনতে পায় গুরুদেব বলছেন—'ওরে ও কেবল, আর-একটা খালি গ্লাস দে বাবা। বেচারি ভয় পাচ্ছে। গাঁয়ের ছেলে তো! হাঁসখালি গাঁ ছেড়ে বাইরে আসেনি কখনও বোধহয়।'

যন্ত্রচালিতের মত কেবলচন্দ্র আর একটা খালি গ্লাস এগিয়ে দেয়। কিছুটা সরবত সে-গ্লাসে ঢেলে নিয়ে গুরুদেব অম্লান বদনে সেটা এক নিশ্বাসে পান করেন। বলেন, 'খেয়ে নাও বাবা বটুক। ওতে বিষ মাখানো নেই।'

বিনা বাক্যব্যয়ে হেবো সরবতটা খেয়ে ফেলে। চমৎকার কমলালেবুর সরবত!

ইষ্টদেবকে নিবেদন করে গুরুদেব এবার সেবায় মনোনিবেশ করেন। কাঠের পুতুলের মত বসে থাকে হেবো। বোঝে, কঠিন বিচ্ছুর পাল্লায় পড়েছে সে এবার। মন্ত্রশক্তিতে এতদিন বিশ্বাস করত না। অনেক সাধু সন্ন্যাসী এসব বিভূতির খেলা দেখাতে পারেন শুনেছিল আগে—কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। এখনও বুঝে উঠতে পারছে না, এইমাত্র যা দেখল তা সত্যই অলৌকিক ক্ষমতা, না সস্তা মাদারির খেল্—ম্যাজিক। কিন্তু গুরুদেব তাকে চিন্তা করবার অবকাশ না দিয়েই বলে ওঠেন, তোমার তো সায়েন্স, নয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা বলে বাঙলা ইংরাজি দুটোকে যেন উপেক্ষা কোরো না; জান তো, ঐ দুটোতেই সায়েন্সের ছেলেরা বেশি ফেল করে। বাঙলায় কেমন নম্বর পেয়েছিলে টেস্ট পরীক্ষায়?'

হেবো অম্লান বদনে বলল, 'বাষট্টি।'

সলুচি মহাপ্রসাদের ছটাকখানেক ওজনের একটি কণিকা জড়িয়ে মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করে গুরুদেব বলেন, 'এসে কী লিখেছিলে?'

'এসে?'

'হ্যাঁ গো, এসে—মানে প্রবন্ধ। বাঙলা সেকেণ্ড পেপারে প্রবন্ধ থাকে না তোমাদের?'

গুরুদেব কি টিউশানি করেন নাকি? মায় সেকেণ্ড পেপার পর্যন্ত জানা আছে তাঁর? সামলে নিয়ে বলে, 'ও এসে! আমাদের 'এসে' ছিল, "তোমার প্রিয় লেখক"।'

দাঁতের ফাঁক থেকে মহাপ্রসাদের একটা কুচি বার করবার চেষ্টা করতে করতে গুরুদেব বলেন, 'অ। তা কী লিখেছিলে তুমি? কে তোমার প্রিয় লেখক?'

'আজ্ঞে রবীন্দ্রনাথের কথা লিখেছিলাম।'

'আশ্চর্য!'

আশ্চর্য হয় হেবোই। এতে আশ্চর্যের কী আছে রে বাবা? বলেও সে কথা—'কেন, আশ্চর্য মনে হচ্ছে কেন?'

'আমাকে যদি কেউ ও প্রশ্ন দিত—আর আমি যদি তোমার বয়সী ছেলে হতাম, তাহলে আমি লিখতাম—কনান ডয়েল!'

কণ্ঠনালী পর্যন্ত শুকিয়ে ওঠে হেবোর। লোকটা 'থট রীডিং' জানে না কি? মানে হেবোর মনের কথাও ও লোকটা বুঝতে পারছে নাকি? না হলে হঠাৎ কনান ডয়েলের নাম আসে কোথা থেকে? একটা উল্টো চাল চালতে হেবো বলে—'কনান ডয়েল কে? কোন সাহেব?'

মহাপ্রসাদের একটি টেংরি চুষতে চুষতে গুরুদেব বলেন, 'স্যর আর্থার কনান ডয়েল হচ্ছেন শার্লক হোমসের বাবা!

হেবো এবার স্পিক-টি-নট! কেঁচো খুঁড়তে আবার কোন সাপ বেরুবে কি জানি! দু-চার মিনিট কোন কথা নেই। হেবো বসে বসে ঘামছে। গুরুদেব নিমীলিতনেত্রে প্রসাদস্থি চুষছেন। হঠাৎ আবার তিনি হাসি-হাসি মুখে বলেন, 'কই তুমি তো বললে না শার্লক হোম্‌স্ কে? তিনি কোনও সাহেব নাকি?'

হেবো এবারও কোন সাড়াশব্দ করে না।

হঠাৎ চোখদুটি খুলে গুরুদেব বলেন,'ওহো, তোমার একখানা বই নিয়ে এসেছিলাম। দেখা হয়ে গেছে। ওটা নিয়ে যাও তুমি। —কেবল বাবা—'

আর কিছু বলতে হল না। কেবলানন্দ গুরুদেবের ঝোলা ঝেড়ে এক খণ্ড টেস্ট পেপার এনে হেবোর হাতে দেয়। আবার চোখ বুজে লুচি-মাংসের সেবা করতে করতে গুরুদেব বলেন, 'বাবা বটু, ঐ গ্রন্থের পাঁচশো একত্রিশ পৃষ্ঠাটা খোল তো একবার।'

হেবো দুরু দুরু বক্ষে নির্দেশমতো পৃষ্ঠাটা খোলে। গুরুদেব নিমীলিত নেত্র অবস্থাতেই বলেন, 'ওটা হাঁসখালি ইস্কুলের বাঙলার সেকেণ্ড পেপার। তাই নয়?'

হেবো জবাব দেয় না।

'ছয় নম্বর প্রশ্নটা এবার দেখ। মনে কর এবার তুমি হাঁসখালি স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা দিচ্ছ। তোমার সামনে তিনটি অলটারনেটিভ 'এসে' আছে—বাংলার বর্ষাকাল , সংবাদপত্র আর ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা। কোনটা লিখবে তুমি?'

খাচ্ছেন গুরুদেব, অথচ গলাটা বুজে গেছে হেবোর। কী বলবে ভেবে পায় না। আবার দু-চার মিনিট আহারপর্ব চালিয়ে ক্ষীরের বাটিটা টেনে নেন গুরুদেব। হঠাৎ যেন খেয়াল হয়েছে সেইভাবে বলে ওঠেন, 'ওহো! কী ভুলো মন দেখ আমার! তোমাকে বলছি—মনে

কর তুমি হাঁসখালি ইস্কুলের ছাত্র! ওমা! এ-কথা মনে করার কী আছে? তুমি তো সত্যিই তাই। নয়?'

হেবো ভাবছিল একগ্লাস জল পেলে খেত।

'আচ্ছা থাক। এবার ঘরে যাও তুমি। সামনে পরীক্ষা, রাত জাগা ঠিক নয়।'

হেবো এবার আর প্রণাম করে না। মাথাটা নিচু করে টেস্ট পেপারখানা বগলদাবা করে রওনা দেয়। দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়েছে, পিছন থেকে গুরুদেব ডাকেন—'বাবা হেবো!'

'আজ্ঞে?' —ঘুরে দাঁড়ায় হেবো।

এবং তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে, প্রচণ্ড ভুল করে বসেছে সে। কিন্তু উপায় নেই, ডাকে যখন সাড়া দিয়ে ফেলেছে, তখন আর কী করা যায়! তবু যতদূর সম্ভব ম্যানেজ করে বলে, 'আমাকে হেবো বলে ডাকলেন যে? আমার নাম তো বটু।'

'—ওহো! তাই তো! তাই তো! আমার ভারি ভুলো মন। হেবো তো তোমার নাম নয়, শার্লক হোমসের কথা ভাবতে ভাবতে আমি হেবোর কথা ভেবে ফেলেছি! তুমি তো বটুক, —হেবো হবে কেন? তুমি তো হাঁসখালি ইস্কুলের পাতিহাঁসের মতো লক্ষ্মী ছেলে—আর হেবোটা হচ্ছে একটা হাড়-বজ্জাত বোম্বেটে শয়তান!'

কানদুটো লাল হয়ে ওঠে হেবোর। উপায় নেই। এ অপমান তাকে সহ্য করে যেতে হবে। আজ সে হেবো নয়, সে বটুকনাথ বটব্যাল। মনে মনে ভাবে, শিশুপালের শত গালাগাল সহ্য করতে হয়েছিল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে। সেও করবে। শিশুপাল বধের শুভলগ্ন এলে হবে এর কড়ায় গণ্ডায় শোধ। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'আর কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ বাবা ব্যাটবল, বলব। তুমি প্রবীরকে চেন? প্রবীর মুখজ্জে?'

ধরা যখন পড়ে গেছে তখন আর তাস লুকিয়ে লাভ নেই। সম্মুখ রণক্ষেত্রেই শিশুপাল-বধ করতে হবে তাকে। আর আত্মগোপন নিরর্থক। বললে, 'হ্যাঁ চিনি। কিন্তু কেন বলুন তো?'

'পবুকে বোলো, মহাভারতের অভিমন্যু-বধ অধ্যায়টা পড়তে। বোলো, আমি বলেছি—মহারথীতে মহারথীতে যেখানে যুদ্ধ হয়, সেখানে অভিমন্যুর মতো চ্যাংড়াকে বলি দিতে পাঠাতে নেই। বড় করুণ ঐ অভিমন্যুর চ্যাপটা হয়ে যাবার চ্যাপ্ টারটা, নয়?'

আর সহ্য করতে পারে না হেবো। সে তো আর শ্রীকৃষ্ণ নয়! ভীমসেনও পারেনি কীচককে ক্ষমা করতে। ছদ্মবেশ ত্যাগ করে বধ করে ফেলেছিল কীচককে। বললে, 'আপনার পিতৃদেব বেঁচে আছেন?'

সরপুরিয়া চিবানো বন্ধ হয়ে যায় গুরুদেবের, চোখ দুটো ধ্বক করে জ্বলে ওঠে। বলেন, 'আছেন, কিন্তু কেন হে ছোকরা? সে খোঁজে তোমার কী প্রয়োজন?'

'না, তাই বলছিলাম। তাঁর জন্যেই দুঃখ হচ্ছে আমার।'

চর্বণ-কার্য বন্ধ হয়ে গেছে গুরুদেবের।

হেবো দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে বলে, 'দেখুন আপনি বিচার করে। রথীমহারথীর মধ্যে লড়াই হচ্ছিল—অভিমন্যু বয়সে ছোট, তবু ক্ষত্রিয় যোদ্ধা সে। লড়াইয়ে সেও প্রাণ দিল, তাতে দুঃখ নেই। মরল বেটা জয়দ্রথও। তারও রেহাই পাওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু ও চ্যাপটারের সবচেয়ে করুণ অধ্যায় কী জানেন? খামোখা ঐ পাষণ্ড জয়দ্রথের বাপ বেচারির মুণ্ডু গেল উড়ে।'

বলেই অ্যাবাউট টার্ন!

এবং তৎক্ষণাৎ ফরোয়ার্ড মার্চ!

যতটা কঠিন মনে হয়েছিল সমস্যাটা তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি কঠিন। কঠিন এবং জটিল। গুরুদেব লোকটি পাক্কা খলিফা! খলিফার চেয়েও বড়, একটি ধড়িবাজ ঘড়িয়াল! হেবোর নাড়ী-নক্ষত্র বেটা জেনে ফেলেছে। হয়ত প্রবীরকাকুর পেছনে ওর গুপ্তচর ঘুরছে। হয়ত লোকটা একটা পাক্কা আঁধারের কারবারী। এত দুঃখেও একটু গর্ববোধ না করে পারল না হেবো। তাহলে অন্ধকার মহলের কারবারীরাও শার্লক হেবোকে চিনতে শুরু করেছে!

কিন্তু উপস্থিত সমস্যাটার কী করা যায়? আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার আগে হেবো তার নোটবইতে চতুর্থ সম্ভাবনার কথাটাও লিখে রাখল :

(৪) নূতন উইল করবার আগেই যদি সুধাকান্তের চেতনা ফেরে :

ক। যদি তখন গুরুদেব-বাবাজির স্বরূপটা তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় (কঠিন কাজ!)

খ। যদি মঞ্জুলা দেবী আর তাঁর সন্তানকে তিনি ভালবেসে ফেলেন। (বাবাজি বেঁচে থাকতে?)

পরদিন সকালে হেবো লক্ষ্য করল একটা সিল্কের চাদর কাঁধের উপর ফেলে নাটের গুরু তাঁর ঝোলা ও লাঠি নিয়ে কোথায় চলছেন হুড়মুড়িয়ে। তৎক্ষণাৎ চটিটা পায়ে গলিয়ে হেবোও নেমে আসে উপর থেকে। গুরুদেব গেট খুলে বাইরে এসে একটা রিক্‌শা ভাড়া করে কোথায় যেন রওনা হয়ে পড়লেন। হেবো স্থির করল— ওঁকে অনুসরণ করতে হবে। কোথায় যাচ্ছে লোকটা? উদ্দেশ্য কী? দ্বিতীয় একটা রিক্‌শাকে ইঙ্গিত করা মাত্র দাড়িওয়াল একজন রিক্‌শাওয়ালা এগিয়ে এল।

'কোথায় যাবেন বাবু?'

রিক্‌শায় উঠে বসে হেবো বললে, 'ঐ রিক্‌শাটার পিছু-পিছু চল।'

রিক্‌শাওয়ালা ওকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা দেয়। আগের রিক্‌শাখানা প্রায় পঞ্চাশ ফুট সামনে চলেছে। গুরুদেব ওকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেননি। কোথায় চলেছেন উনি? গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়েই সোজা উত্তরমুখে বাঁক নিল। হেবোর রিক্‌শাখানা কিন্তু বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

হেবো ব্যস্ত হয়ে বলে, 'একি? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?

মুখটা না ফিরিয়েই রিক্‌শাওয়ালা বলে, 'এখানে নেমে ফিরে যাও। আমিই ফলো করছি ওকে।'

হেবো অবাক হয়ে যায়। কী আশ্চর্য! ঐ একমুখ দাড়িওয়ালা রিক্‌শাচালককে সে পর্যন্ত চিনতে পারেনি! হেবো নেমে পড়ে সেখানেই। উত্তরমুখো ঘুরে প্রবীরচন্দ্রের রিক্‌শাখানা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায় দৃষ্টির আড়ালে।

সন্ধ্যাবেলায় যথারীতি হেবো হাজিরা দিল প্রবীরচন্দ্রের বোর্ডিংএ। শুনল গুরুদেব সকালবেলা গিয়েছিলেন পোস্ট-অফিসে। একখানি আর্জেন্ট টেলিগ্রাফ করেছেন তিনি। প্রবীরচন্দ্র অনেক কায়দা করে জেনে এসেছেন, সেখানি গেছে কলকাতার একটি সলিসিটর ফার্মের নামে। মিস্টার জি. এন. দে অ্যাডভোকেটকে গুরুদেব আগামী শুক্রবার আসতে অনুরোধ করেছেন।

প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'বুধবার অর্থাৎ পরশুদিনের মধ্যেই আমাদের যা হয় করতে হবে। দে-সাহেব হচ্ছেন ওঁর আশ্রমের অ্যাটর্নি। উইলে সাক্ষী থাকতে আসছেন তিনি।'

হেবো বলে, 'কলকাতায় গিয়ে যদি দে-সাহেবকে সব কথা খুলে বলা যায়?'

'তাহলেও লাভ নেই। তিনি ওঁর অ্যাটর্নি—ওঁরই স্বার্থ দেখবেন। তাছাড়া কাজটা বে-আইনি তো হচ্ছে না কিছু। সুধাকান্তবাবুর স্বাধীন ইচ্ছায় তুমি-আমি বাধা দেবার কে?'

'তাহলে?'

'তাই তো ভাবছি। আর তো সময় নেই। কী করা যায়?'

হেবো ফিরে আসে তার ঘরে। একবার চেষ্টা করে সুধাকান্তের সঙ্গে দেখা করবার, চতুর্থ সম্ভাবনার সূত্রটি টিকবে কি না পরীক্ষা করতে; কিন্তু কেবলানন্দ পাহারায় বসে আছে। ভিতরে ঢুকতেই দিল না তাকে।

ডাক্তার নবীনচন্দ্র এ শহরের নামকরা ডাক্তার। সুধাকান্তের পরিবারের সব কথাই জানেন। শেষ পর্যন্ত হেবো তাঁরই শরণাপন্ন হল। ডাক্তারবাবুর চেম্বারের শেষ রুগীটি বিদায় নিলে এগিয়ে এল হেবো। বলল তার মনের কথা, মানে সুধাকান্তবাবুর উইলের কথা। শুনে ডাক্তারবাবু বলেন, 'কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারছি না!'

হেবো নিজের প্রকৃত পরিচয়ই দিল, অর্থাৎ মঞ্জুলা দেবী ওর কাকিমার ছোট বোন।

ডাক্তারবাবু শেষ পর্যন্ত বললেন, 'সবই তো জানি বাবা, কিন্তু আমি কী করতে পারি? জেনে-শুনে বিষ তো আর খাওয়াতে পারি না!'

তা ঠিক। ফিরে আসে হেবো।

সারা রাত ঘুম হল না বেচারির। হেরে যাবে সে? অমন একটা ধড়িবাজ বদমায়েসের খপ্পর থেকে একটি বিধবা আর তাঁর নাবালক ছেলেকে রক্ষা করতে পারবে না? লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত, সম্ভবত মন্ত্র-তন্ত্রও জানে। সুধাকান্তকে হয়ত সে সম্মোহিত করে ফেলেছে। একটা রক্তচোষা বাদুড় যেমন দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে শিকারকে শেষ করে দেয়—এই

পরিবারটিকে গুরুদেব তেমনি সস্নেহে আলিঙ্গনবদ্ধ করেছেন। শেষ বিন্দু রক্তটি নিঃশেষ হবার আগে তিনি নড়ছেন না।

সারারাত ছটফট করতে করতে ভোর রাত্রের দিকে একটা সূক্ষ্ম চিন্তার ক্ষীণ আভাস এল ওর মাথায়। একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল ওর। গত বছর দোলের দিনের কথা। চট করে উঠে বসে হেবো। আলোটা জ্বাল। দোল কী মাসে হয়? ফাল্গুন, অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল। নোটবইটা খোলে—হ্যাঁ, নোটবইতে টোকা আছে ঘটনাটা। এই তো একটা নূতন সম্ভাবনার সূত্র পাওয়া গেছে! গেছে কি? খুব কঠিন কাজ। ভাগ্যের উপর অনেকটা নির্ভর করতে হবে। কিন্তু ভাগ্য তো তাদেরই সহায়তা করে, যারা পুরুষকারকে কাজে লাগায়!

অন্ধকার ঘরে পায়চারি করতে করতে চিন্তা করতে থাকে। ধাপে-ধাপে ধীরে-ধীরে কার্যক্রমের সোপানগুলি সাজিয়ে নেয় মনে মনে। প্রথম কাজ কী? কী কী বাধাবিঘ্ন দেখা দিতে পারে? কী কী তার সমাধান? তারপর দ্বিতীয় পদক্ষেপ। কোন কোন বিপত্তি আসতে পারে?

হঠাৎ জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। সকাল হয়ে এসেছে। ভোরবেলা একটা লোকাল ট্রেন আছে—কলকাতা যাওয়ার। ঐ ট্রেনেই যেতে হবে তাকে। প্রবীরচন্দ্রকে খবর দেওয়ার সময় নেই, প্রয়োজনও নেই। তারও আর পাহারা দেওয়ার কোন দরকার নেই। শুক্রবারের আগে যখন উইল লেখা হবে না। তখন এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে কী লাভ?

ভোরের ট্রেনেই হেবো ফিরে এল কলকাতায়। এল ওদের বাড়িতে। বাবা মা এখনও ফিরে আসেননি, বাঁচা গেল। কাকাও বাড়ি নেই—কোথায় যেন বেরিয়েছেন। কাকিমা ওকে দেখে বললেন, 'কী হল রে হেবো, খবর কী?'

'শীগ্‌গির আমাকে কিছু টাকা দাও দেখি!'

'টাকা? কত টাকা? কী করবি?'

'কী করব তার কিরিস্তি শুনে কী হবে? কিন্তু তুমি কি ভেবেছিলে এ কাজ একেবারে ফোকট্‌সে হয়ে যাবে? আমার প্রফেশনাল ফিজ তো আমি দাবিই করছি না। প্রথমত, এখনও আমি প্রফেশনাল নই, দ্বিতীয়ত এটা ঘরোয়া কাজ। তোমার কাছে আবার ফি নেব কী? তবু হাত-খরচা তো আছে।

'কত টাকা লাগবে বল!'

'আপাতত গোটা-পঞ্চাশ ছাড়।'

'মঞ্জুলা কেমন আছে?'

'ও সব খেজুরে আলাপ পরে হবে, কাকিমা। তাড়াতাড়ি টাকাটা দাও! শিশুপাল-বধ যজ্ঞে আহুতি দিতে হবে।'

'শিশুপাল-বধ যজ্ঞে! কী সব বলছিস তুই!'

'আচ্ছা না হয় কীচর-বধ পালাই হল। দাও টাকাটা।'

'তোর একটা কথাও বুঝি না বাপু! আসল কথা বল। তায়ইমশাইকে বোঝাতে পারলি?'

'তায়ইমশাই মানে ঐ বুড়োটা তো? ওর ভীমরতি সারবার নয়! বাহাত্তুরে ধরেছে আর কি।'

'তাহলে?'

'পারি না আর বক-বক করতে!'

'বেশ, নে বাপু!'

রাগ করেই টাকা কটা বার করে দেন কাকিমা। আর সেটা পকেটস্থ করেই বেরিয়ে যায় হেবো। চুনো-পুঁটি তো নয়, ঘাই-মারা রাঘব বোয়াল সে ছিপে গেঁথে তুলতে চায়! সুতোর জোর থাকা চাই; টোপটা শুধু লোভনীয় নয়, নিখুঁতও হওয়া চাই। একটু সন্দেহ হলেই রাঘব বোয়াল টোপ ঠুকরে ফিরে যাবে—কপাৎ করে গিলবে না।

কৃষ্ণনগরে ফিরে আসে সেই রাত্রেই।

পরদিন, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ডাক্তারবাবু যখন সুধাকান্তকে দেখতে এলেন তখন গুরুদেব বাড়ি ছিলেন না। হেবো গুটি-গুটি ঢুকল ঐ ঘরে। সুধাকান্ত বেশ সুস্থই আছেন। উঠে বসেছেন তিনি। হেবো তাঁর বালিশটা ঠিক করে দেবার অছিলায় দেখে নিল, বালিশের নিচে লোহার সিন্দুকের চাবির থোকাটা আছে। আর আছে একটা খাম, মুখটা ছেঁড়া। দেখেই বুঝতে পারে, এর গর্ভেই ছিল আগেকার উইলটা। তার মানে, আগেকার উইলটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ডাক্তারবাবু বলেন, 'ব্লাড প্রেশার দেখার যন্ত্রটা নিচে আমার গাড়িতে আছে। নিয়ে এস তো!'

হেবো শুনতে না পাওয়ার ভঙ্গি করে জানলার দিকে সরে যায়। জানলার পাশেই সুধাকান্তের লেখবার টেবিল। কিছু ফাইল পত্র, কাগজচাপা, বই, কলমদানিতে কলম, ব্লটার ইত্যাদি সাজানো। হেবো সরে যায় টেবিলের দিকে।

হেবো শুনতে পায়নি মনে করে কেবলানন্দই নিচে নেমে যায় রক্তচাপ মাপবার যন্ত্রটা আনতে। মিনিট আড়াই তিন লাগবে ওর ফিরে আসতে, এর মধ্যেই হেবোকে হাতসাফাই করতে হবে; কিন্তু সুধাকান্ত জেগে বসে আছেন। ডাক্তারবাবুও এদিকে ফিরে বসে আছেন। তবু শেষ চেষ্টা করবে হেবো।

হ্যাঁ, তিন মিনিটের মধ্যেই কেবলানন্দ ফিরে এল বাক্সটা নিয়ে।

পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবুর মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়।

সুধাকান্ত বলেন, 'কি হে ডাক্তার, অত গোমড়া মুখ করলে কেন? সময় কি একেবারেই ফুরিয়ে এসেছে?'

'না না, তা কেন? তবে প্রেশারটা হঠাৎ খুব বেড়ে গেছে। রাত্রে ঘুম হয়েছিল?'

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সুধাকান্ত বলেন, 'আর চব্বিশ ঘণ্টা টিকব তো?'

'সে কি কথা? অনেক দিন বাঁচবেন এখনও!'

'বাজে কথা বোলো না ডাক্তার। আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। সবই বুঝছি আমি। কিন্তু বিষয়-সম্পত্তির একটা বিলি-ব্যবস্থা না করে যেতে পারলে মরেও আমি শান্তি পাব না। আগামীকাল আমি উইল করব স্থির করেছি। তাই বলছি, আজ রাত্রের মধ্যে কিছু হবে না তো?

ডাক্তারবাবু বুঝতে পারেন এই প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তিটির কাছে গোপন করার কিছু নেই। বলেন, 'না, সে-রকম কিছু ভয় করার নেই।'

'তাহলেই হল। বেশ, কাল তাহলে এই সময় এসে আমার উইলে সাক্ষী হিসেবে একটা সই দিয়ে যেও। আমি যে সুস্থ মনে এ উইল করেছি তার একটা প্রমাণ থাকা দরকার। ডাক্তারের সইটা থাকা ভাল।'

ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আসব।'

হেবো ইতিপূর্বেই তার নোটবইতে ২(ক) সূত্রটা কেটে দিয়েছিল গুরুদেব টেলিগ্রাম করেছেন শুনে। এখন মনে মনে ২(খ) সূত্রটাও কেটে দিল। একে একে সব সম্ভাবনাগুলিই নির্মূল হয়ে যাচ্ছে।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন।

হেবো ঠাকুর-দেবতাকে বড় বেশি ডাকে না। পরীক্ষার ঠিক আগে তাঁদের মনে পড়ে বটে—কিন্তু বছরের আর বাকি কটা দিন তাঁদের কথা বিশেষ মনে থাকে না। আজকের দিনটা কিন্তু ব্যতিক্রম। ডাক্তারবাবু চলে যেতেই সে ছুটে চলে আসে তার ঘরে। দরজায় খিল দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। মনে মনে বলে, 'হে মা কালী! তুমিই বল, আমি কি কিছু অন্যায় করছি? আমি নিত্য ডাকাডাকি করে তোমাকে বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাই না—আর ঐ গুরুদেব রোজ সকাল-সন্ধ্যা তোমাকে পাঁঠার মাংস খাওয়াতে চায়। কিন্তু তাই বলেই কি তুমি ও-দলে যোগ দেবে? যে টোপ পেতে এলাম, ঐ রাঘব-বোয়াল যেন সেটা গিলে ফেলে—এটুকুই তুমি কোরো মা! বাকি খেলিয়ে তোলার দায়িত্ব আমার। আর ওকে দিয়ে যদি টোপটা তুমি না গেলাও, তবে বলব তুমি মিথ্যে, তুমি মিথ্যে, তুমি মিথ্যে!'

* * *

শুক্রবার সকালে হেবোর ঘুম ভাঙল একটা চেঁচামিচিতে। কাল রাত্রে নাকি বাড়িতে চোর এসেছিল। কী আশ্চর্য! স্বয়ং শার্লক হেবো যে বাড়িতে উপস্থিত সে বাড়িতে চোর? অথচ হেবো রাত্রে কিছু টেরই পায়নি?' সকালবেলা কেবলানন্দ প্রথম লক্ষ্য করে, সিঁড়ির দরজাটা খোলা। গুরুদেব ঘরের দরজা খুলে শোন, দক্ষিণা বাতাসের লোভে। হেবোও দরজা খুলে শোয়। সুধাকান্তের ঘর অবশ্য ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। সে ঘরে মেঝেতে শোয় কেবলানন্দ। পরীক্ষা করে দেখা গেল চোর একতলা থেকে কিছুই সরায়নি, দোতলার দুটি ঘর থেকেই মাল সরিয়েছে। হেবোর স্যুটকেস নেই, গুরুদেবের ঝোলাটিও নেই। গুরুদেব

দারোয়ানকে ডেকে প্রচণ্ড ধমক দিলেন। সে হলপ করে বলল—বাইরে থেকে চোর আসেনি, কারণ সে জেগেই ছিল। কিন্তু বাইরের লোক ছাড়া আর কে চুরি করতে পারে? পুলিসে খবর দেওয়া হবে কি না স্থির করার আগেই ঠাকুর এসে খবর দিল, বাগানের ভিতর ভাঙা স্যুটকেস ও ঝোলা পাওয়া গেছে। আবার নূতন করে হিসাব নেওয়া গেল। না, বেশি কিছু খোয়া যায়নি। হেবোর গেছে একটি টেরিলিনের শার্ট আর গোটা-কুড়ি টাকা। গুরুদেবের ঝুলির সব কিছুই প্রায় পাওয়া গেছে। দামী কিছুই ছিল না ওতে। দুটো জিনিস একটু দামী ছিল—দুটোই বেহাত হয়েছে। একটা রুপোর কোশাকুশি আর একটা শেফার্স কলম।

হেবো থানায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কিন্তু গুরুদেব বাধা দিলেন। বললেন, 'যা গেছে তা তো পাওয়া যাবেই না, উপরন্তু ঠাকুরটাকে ধরে নিয়ে যাবে ওরা। আজ কলকাতা থেকে বিশিষ্ট অতিথি আসছেন—ঠাকুর না থাকলে মহা মুশকিল।

মঞ্জুলা দেবীও সায় দিলেন সে কথায়।

হেবো জনান্তিকে মঞ্জুলা দেবীকে বলে, 'আসল কথা গুরুদেবের ভয় হয়েছে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে। পুলিসের খাতায় হয়ত তাঁর নাম আছে, হয়ত তাঁকেই হাজতে পুরবে পুলিস!'

মঞ্জুলা দেবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেবোর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তাই কি কাল রাত্রে চোর এসেছিল?'

হেবো বলে, 'তার মানে?'

'তার মানে, তোমার কোন কারসাজি নয় তো?'

হেবো বলে, 'কী যে বলেন! আমারও তো জিনিস খোয়া গেছে।'

যাই হোক শেষ পর্যন্ত পুলিসে খবর দেওয়া হল না।

বেলা বাড়ল। বেলা দশটা নাগাদ এসে পৌঁছলেন অ্যাডভোকেট জি. দে। সসম্মানে তাঁকে উপরের ঘরে নিয়ে গেলেন গুরুদেব। চা-জলখাবারের পর্ব মিটলে বুলডাগটাকে দরজার বাইরে বসিয়ে ওঁরা অর্গলবদ্ধ ঘরে পরামর্শে বসলেন। হেবো নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল লাগালো। মাঝের দরজার চাবির ফুটোতে চোখ লাগিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। কান লাগিয়ে বরং দু-একটা কাটা কাটা কথা শোনা যায়। অ্যাডভোকেট সাহেব বলছেন, 'এবার ড্রাফটখানা নিঁখুত হয়েছে, আমি ফেয়ার কপি করে ফেলি।'

সুধাকান্ত বাধা দিয়ে বলেন, 'না, ফেয়ার কপিটা আমি নিজে হাতে লিখব। আজ বেশ সুস্থ আছি আমি।'

গুরুদেব বললেন, 'কিন্তু তাতে কি কষ্ট হবে না তোমার?'

সুধাকান্তের হাসিটা চোখে না দেখতে পেলেও অনুভব করে হেবো। তিনি হেসে বলেন, 'কষ্ট হলেও উপায় নেই। আইনের খুঁত আমি রাখব না। আদ্যোপান্ত হাতের লেখাটা আমার হলে আইনগত তার মর্যাদা বাড়বে —না কি বলেন দে-সাহেব?'

দে-সাহেবের জবাবটা শোনা গেল না; কিন্তু সুধাকান্তের পরবর্তী বক্তব্যটা শোনা যায়—'দয়া করে আমার ঐ কলমটা দেবেন। নিজের কলম ছাড়া লিখতে পারি না আমি।'

প্রায় মিনিট পনের পরে নিচে গেটের সামনে একটা মোটর গাড়ি এসে দাঁড়াল। কেবলানন্দ হন্তদন্ত হয়ে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। বন্ধ ঘরে টোকা দিয়ে বলল, 'ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

হেবোও বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দেখে নকুলচন্দ্র আর ডাক্তারবাবু সিঁড়ি দিয়ে উপরে আসছেন। ওঁদের পিছনে পিছনে ঢুকে পড়ে রোগীর ঘরে। রোগী আজ বেশ প্রফুল্ল। বলেন, 'ডাক্তার, আমাকে আজ বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ দিকি।'

'কেন, হঠাৎ আজ ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে কেন?'

'আমি সুস্থ স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় আছি কি না, দেখে বল।'

'ও, উইলটা করেছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, একটা সইও দিতে হবে তোমাকে। নকুল, তুমিও দেবে।'

ডাক্তারবাবু রোগীকে পরীক্ষা করেন। তারপর কোন কথা না বলে উইলখানা টেনে নেন। সমস্তটা ধৈর্য ধরে পড়ে কাগজখানা ফিরিয়ে দেন সুধাকান্তকে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে আপনি মাপ করবেন সুধাকান্তবাবু, আমি এ উইলে সাক্ষী থাকতে পারব না। এ অনুরোধ করবেন না আপনি।'

একটু রুক্ষ স্বরে সুধাকান্ত বলেন, 'কেন? কারণ কী?'

'আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়, আপনাকে শ্রদ্ধা করি আমি। তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ আপনি অত্যন্ত অন্যায় করছেন।'

রুক্ষতর স্বরে সুধাকান্ত বলেন, 'কিন্তু সে বিচারের ভার তো তোমার উপর নেই, ডাক্তার! তুমি ভিজিট নিয়ে আমাকে দেখতে এসেছ। আমি যে স্বাভাবিক অবস্থায় আছি তার সার্টিফিকেট আমি আইনত দাবি করতে পারি।'

'না, পারেন না। কারণ আজকের ভিজিট আমি নেব না।'

বাক্স গুছিয়ে উঠে পড়ার উপক্রম করেন ডাক্তারবাবু।

হেবো মুহূর্তমাত্র কালবিলম্ব না করে ছুটে যায় নিচে। মঞ্জুলা দেবীকে খুঁজে বের করে তাঁর হাতদুটি চেপ ধরে—'সর্বনাশ হয়েছে কাকিমা, একটা কাজ করতেই হবে আপনাকে! যেমন করে হোক!'

'কী হয়েছে? অমন করছ কেন তুমি?'

'ডাক্তারবাবু উইলে সাক্ষী হতে অস্বীকার করেছেন। যেমন করে পারেন তাঁকে রাজী করান!'

কেন, কী বৃত্তান্ত কিছুই প্রশ্ন করেন না মঞ্জুলা দেবী। বলেন, 'বেশ, সেই ব্যবস্থাই করছি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন ডাক্তারবাবু গট-গট করে নেমে আসছেন দ্বিতল থেকে। মাথায় আচলটা তুলে দিয়ে এগিয়ে আসেন মঞ্জুলা দেবী। বলেন, 'একটা কথা ছিল ডাক্তারবাবু'

'বল মা?'

'আপনি আপত্তি করবেন না। উইলে আপনি সই দিয়ে আসুন।'

ভ্রূ-দুটি কুঁচকে ওঠে ডাক্তারবাবুর। বলেন, কিন্তু কেন বল তো মা? উইল তুমি দেখেছ?'

মঞ্জুলা বলেন, 'না, দেখিনি। তবে আন্দাজ করতে পারি। আমাদের বিষয় থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এই তো?'

'হ্যাঁ, তাই। এতে আমাকে সই দিতে বলছ কেন?

হেবো ভাবে, এইবার মঞ্জুলা দেবীর আর কোন জবাব নেই। বস্তুত তার মত উপস্থিত-বুদ্ধি-ওয়ালা ছেলের মাথাতেও কোনও ফন্দি বার হল না। কিন্তু হেবো জানত না যে, যারা নিছক সরল ও সহজ তারা অনেক বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে যেতে পারে তাদের সারল্যের জন্যেই। যে জবাব হেবোর মুখে জোগায়নি, মঞ্জুলার মুখে তাই জোগাল, আর, সেটা কোন ফন্দি নয়। তাঁর আন্তরিক কৈফিয়তই।

মঞ্জুলা শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আপনি সই না দিলে অন্য কোন ডাক্তারে তা দেবে। শহরে ডাক্তারের তো অভাব নেই। কিন্তু যতক্ষণ ঐ উইল-পর্ব শেষ না হচ্ছে, ততক্ষণ ওঁরা আমাকে বাবার কাছে যেতে দেবেন না। শেষ সময়ে ওঁর কোন সেবা-যত্নই হচ্ছে না। খোকার বাবা নিশ্চয়ই স্বর্গে থেকেও এজন্য শান্তি পাচ্ছেন না। সম্পত্তি খোকন এমনিও পাবে না, অমনিও নয়— অন্তত শ্বশুরের শেষ সময়ে সেবা করার অধিকারটুকু আপনি আমাকে দিয়ে যান ডাক্তারবাবু!'

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ডাক্তারবাবু বলেন, 'তোমার এ কথায় ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি মা! এমন মেয়েরও সর্বনাশ করেন তিনি? কিন্তু তোমার কথাই ঠিক। ও সম্পত্তি তুমি অমনিতেও পাবে না। নির্মলকে আমিও স্নেহ করতাম। তার আত্মাকে তৃপ্তি দাও তুমি। আমি সই দিয়ে আসছি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!'

সিঁড়ি বেয়ে আবার উপরে উঠে যান তিনি।

হেবো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। নকুলচন্দ্রও সই দিলেন, সেটা পরে জানতে পেরেছিল হেবো।

সব খবর শুনে সন্ধ্যাবেলায় মাথায় হাত দিয়ে বসলেন প্রবীরচন্দ্র।

হেবো বললে, 'কিছু ঘাবড়াবেন না। ঐ উইল নির্ঘাত চুরি যাবে। ফাঁদ পেতে এসেছি আমি।'

প্রবীরচন্দ্র ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেন না।

পরদিন। শনিবার সকাল। গত রাত্রের শেষ দিকে সুধাকান্তের আবার একটা আক্রমণ হয়েছে। যেন উইলটাতে সই করার জন্যেই তিনি মনের জোরে সুস্থ ছিলেন এতদিন। উইল সম্পাদন করার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে মানসিক অবসাদ, অমনি শয্যা নিলেন তিনি। শেষরাত্রে আক্রমণটা হয়েছে, অথচ বাড়ির কেউ জানতে পারেনি। পারবে কোথা থেকে! ওঁর ঘরে থাকে কেবলানন্দ। আর কারও সে ঘরে ঢোকা মানা। কেবলানন্দ রাত-ভোর নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে, সকালে সে উঠে জানতে পেরেছে। তাই সাত-সকালেই সোরগোল পড়েছে বাড়িতে। মঞ্জুলা দেবী খবর পেয়ে ছুটে এলেন উপরে। রোগীর ঘর খোলাই ছিল। সুধাকান্ত অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। মঞ্জুলা আর হেবো ঘরে ঢুকতেই গুরুদেব গর্জন করে ওঠেন, 'আবার তুমি এসেছ উপরের ঘরে? কতদিন না বারণ করেছি! বলেছি না, এ ঘরে আসবে না?

হঠাৎ কি হল মঞ্জুলার! কোথা থেকে দুর্জয় সাহস এল ওর মনে। দৃপ্ত ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দরজার দিতে আঙুল দেখিয়ে শুধু বললেন, 'বেরিয়ে যান বলছি!'

একেবারে থতমত খেয়ে যান গুরুদেব। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমতা-আমতা করে বলেন, 'কী, এত বড় সাহস!'

মঞ্জুলা হেবোকে বলেন, 'দারোয়ান আর গঙ্গারামকে ডাক তো হেবো, এ দুটো লোককে রোগীর ঘর থেকে বার করে দিতে হবে!'

কাঁপতে কাঁপতে খাট থেকে উঠে দাঁড়ান গুরুদেব। কী করবেন, কী বলবেন স্থির করে উঠতে পারেন না। কেবলানন্দ বাঘের মত থাবা গেড়ে বসে আছে—যেন আদেশ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। মঞ্জুলা এগিয়ে যান সুধাকান্তের মাথার কাছে। বালিশের তলা থেকে লোহার সিন্দুকের চাবিটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেন গুরুদেবের দিকে, বলেন, 'এর জন্যেই প্রাণটা পড়ে আছে তো এ-ঘরে? যান, ওটা নিয়ে চলে যান! বাবার মৃত্যু হলে তখন সম্পত্তির দখল নিতে আসবেন। কিন্তু তার আগে ফের যদি এ ঘরে পা বাড়ান, দারোয়ান দিয়ে আপনার ঠ্যাং ভেঙে দেব আমি! যান বলছি।'

অবাক কাণ্ড! অমন প্রবল প্রতাপান্বিত গুরুদেব যেন একেবারে কেঁচোটি হয়ে গেছেন। চাবির গোছটা তুলে নিয়ে গুটি-গুটি বেরিয়ে যান ঘর থেকে। পোষমানা কাবলি বেড়ালের মত কেবলানন্দ যায় তাঁর পিছু-পিছু।

হেবো এগিয়ে এসে মঞ্জুলা দেবীকে প্রণাম করে।

'কি হল রে? হঠাৎ প্রণাম কিসের?'

'সে আমি বোঝাতে পারব না!'

'শোন। এক কাজ কর। ডাক্তারবাবুকে খবর দে।'

কিন্তু ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েও কিছু লাভ হল না।

ডাক্তারবাবু রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন যে, আর বড় জোর দু-দিন। এ দু-দিন মঞ্জুলা প্রাণ ঢেলে শ্বশুরের সেবা করলেন। দুর্ভাগ্য সুধাকান্তের। পুত্রবধুর সেবা যে তিনি পেলেন, তা জানতেও পারলেন না। সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে মঞ্জুলা একবারও বার হলেন না ঘর ছেড়ে।

গুরুদেবেরও কি হল, এ ঘরে একবারও মাথা গলালেন না। পরের দিন কাউকে কিছু না বলে গুরুদেব কোথায় চলে গেলেন তাঁর ঝোলাঝুলি নিয়ে। কেবলানন্দ রয়ে গেল।

হেবো বললে, 'কাকিমা, এবার একবার শেষ চেষ্টা করতে হয়। ওঁর ঘরটা একবার খুঁজে দেখতে চাই, চাবিটা পাওয়া যায় কি না। উইলটা নিশ্চয় ঐ সিন্দুকেই আছে।'

মঞ্জুলা বলেন, 'ওসব থাক হেবো। একটা মরণাপন্ন মানুষের শিয়র থেকে তাঁর উইল চুরি করতে পারব না আমি।'

'আরে, আপনাকে চুরি করতে কে বলছে? যা করবার তা আমিই করব।'

'না! তাঁর শেষ ইচ্ছায় বাধা দেবার কোন অধিকার ধর্মত আমার নেই।'

হেবো, ধমকে উঠে, থামুন তো আপনি! এই যদি ধর্ম হয়, তবে অধর্ম বলে দুনিয়ায় কিছু নেই! আপনাকে কিছু করতে হবে না। শুধু কেবলানন্দকে ঘণ্টা-কয়েকের জন্য এখান থেকে সরিয়ে দিন।'

'তা কেমন করে সরাব আমি?'

'ওর হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বলুন, 'আনন্দময়ীতলায় আপনার শ্বশুরের নামে পুজো দিয়ে আসতে।'

'আনন্দময়ীতলাটা আবার কোথায়?'

'বড় জাগ্রত কালী এখানকার। কেবলানন্দ জানে। মায়ের নামে পুজো দেওয়ার কথায় বেটা না বলতে পারবে না। রিক্‌শা করে গেলেও ঘণ্টা-দুয়েক সময় পাওয়া যাবে।'

উইল চুরি করার ব্যাপারে কোন উৎসাহ না থাকলেও আনন্দময়ী মায়ের নামে পুজো পাঠানোতে মঞ্জুলার আগ্রহ ছিল। কেবলানন্দকে সহজেই সরানো গেল।

তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে গেল হেবো। গুরুদেবের ঘরের প্রত্যেকটি স্থান, প্রত্যেকটা কোণা তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে শুরু করল। বাবাজির একটা ঝোলা আছে, একটি টিনের সুটকেস আছে তালা-বন্ধ নয়। খোলাই। তাড়াতাড়ি করে খুঁজে দেখল হেবো। কা কস্য পরিবেদনা। চাবির থোকা কোথাও নেই।

মঞ্জুলা দেবী এসে বলেন, 'কী পাগল ছেলে তুমি হেবো! গুরুদেব কখনো চাবিটা এ বাড়িতে রেখে যান? সঙ্গে নিয়েই গেছেন তিনি।'

হেবো গম্ভীর হয়ে বললে, 'না, কাকিমা। গোয়েন্দাগিরি যদি একটুও শিখে থাকি তবে নিশ্চিত জানি সেটা তিনি নিয়ে যাননি। এ বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছেন।'

মঞ্জুলা বলেন, 'অসম্ভব!'

'অসম্ভবই মনে হচ্ছে আপনার! তা-ই হওয়ার কথা; কিন্তু আমার এ সিদ্ধান্ত সু-যুক্তির বিশ্লেষণে সুপ্রতিষ্ঠিত। চাবি আমি খুঁজে পাবই।'

হয়ত ঠিক কথাই বলেছেন মঞ্জুলা। গুরুদেবের ঘরটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও চাবির গোছা পাওয়া গেল না। হেবো একটু অবাক হল। এমন তো হওয়ার কথা নয়! তার কি হিসাবে ভুল হল কোথাও! গুরুদেব তো চাবি নিয়ে যেতে পারেন না। তবে কি তিনি আরও কঠিন কোন চাল চেলেছেন?

ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে আসে। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, উনি চাবিটা হেবোর ঘরেই রেখে গেছেন? একবারে বাঘের ঘরে যদি ঘোঘের বাসা হয়ে থাকে? যদি উনি ভেবে থাকেন হেবো সারা বাড়ি খুঁজবে, কিন্তু নিজের ঘরটা খুঁজবে না?

কী অশ্চর্য! যা ভেবেছে তাই। হেবোর ঘরের ভিতর থেকেই উদ্ধার করা গেল চাবির থোকাটা। উপরের একটা কুলুঙ্গিতে পুরনো বইয়ের পিছনে একটা ভাঙা লক্ষ্মীর ঝাঁপির ভিতর থেকে বার হল সেটা। কী ধড়িবাজ লোক! এক নম্বরের ঘড়েল! কোন সুযোগে হেবোর অলক্ষিতে তারই ঘরে চাবিটা লুকিয়ে রেখে গেছে!

তৎক্ষণাৎ সুধাকান্তের ঘরে চলে আসে হেবো। কেবলানন্দের ফিরতে এখনও দেরি আছে। মঞ্জুলা দেবী রোগীর জন্য পথ্য তৈরী করতে নিচে গেছেন। ঘরে আর কেউ নেই। সুধাকান্ত অচৈতন্য। দরজাটা বন্ধ করে দেয় প্রথমে। দ্রুতগতি লোহার সিন্দুকটা খুলে ফেলে হেবো। হ্যাঁ, সামনেই রয়েছে সীলমোহরাঙ্কিত খামটা। সেটা বের করে হেবো আবার সিন্দুকটা বন্ধ করে! খামটা পকেটে ফেলে আবার চাবিটা রেখে আসে সেই ভাঙা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে। আর কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে। এবার কাকা-কাকিমার হাতে উইলটা জমা দিতে হবে। বাবা-মা হয়ত মধুপুর থেকে ফিরে এসেছেন। সোমবার থেকে স্কুলও খুলবে। আর দেরী করা উচিত নয়। কাজ যখন হাসিল হয়ে গেল তখন ফিরে যাওয়াই ভাল।

কাকা-কাকিমা ওকে দেখে বলেন, 'কিরে হেবো, কী খবর?'

হেবো বললে, 'ওয়া গুকজীকি ফতে!'

'তার মানে?'

'তার মানে এই সেই অপয়া উইল! যত্ন করে রেখে দাও।'

'সে কি রে? কেমন করে পেলি?'

'সে অনেক কথা। সুধাকান্তবাবু এখন অচৈতন্য। ডাক্তার বলেছেন তাঁর জ্ঞান আর ফিরবে না। সুতরাং নুতন করে উইল আর করতে পারবেন না। ব্যস, খেল্ খতম!'

কাকিমা বলেন, 'কিন্তু যত্ন করে রেখে কী লাভ? পুড়িয়ে ফেলি বরং ওটাকে।'

কাকা বলেন, 'না না, তার আগে খুলে দেখি ওটাই সেই আসল উইল কি না।'

হেবো বললে, 'এখন নয়, কাকা! গুরুদেবকে দেখিয়ে দেখিয়ে, তার চোখের সামনেই ওটাকে না পোড়ালে আমার গায়ের ঝাল মিটবে না! বেটা বলে কিনা, বজ্জাত বোম্বেটে শয়তান!'

কাকিমা হেসে ওঠেন, 'কাকে বলেছে রে? তোকে?'

'আমাকে বললে তখনই তার নাকটা ভেঙে দিতাম না? বলেছে অন্য একটা ছেলেকে। হাঁসখালি ইস্কুলের একজনকে।'

'তবে তুই অত চটছিস কেন?'

'সে অনেক কথা।'

'প্রবীরের খবর কি?'

হেবো চমকে উঠে বলে, 'ঐ যাঃ! তাঁকে তো খবর দিয়ে আসা হয়নি! নাঃ! এটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে আমার! কাকা, আমি আর একবার যাই বরং।'

'তা যা। তবে কালকেই ফিরে আসিস। দাদারাও কাল সন্ধ্যায় ফিরে আসছেন। প্রবীর বেচারাকে খবরটা এখনই দেওয়া দরকার।'

হেবো আবার রওনা হয়ে পড়ে কৃষ্ণনগর যাবে বলে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হেবোর, কৃষ্ণনগরে গিয়ে সে প্রবীরকাকুর দেখা পেল না। কারণ হেবো রওনা হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই সুধাকান্ত মারা গেলেন। প্রবীরচন্দ্র খবর পেয়ে হেবোর খোঁজে এসেছিলেন, এবং হেবো কলকাতা চলে গেছে শুনে তিনিও চলে এলেন হেবোদের বাড়িতে।

প্রবীরচন্দ্র যখন কলকাতায় ওদের বাড়িতে পৌঁছলেন তার আগেই হেবো রওনা হয়ে গেছে। প্রবীরচন্দ্রের কাছে সংবাদ পেয়ে হেবোর কাকা ও কাকিমা কৃষ্ণনগরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। প্রবীরচন্দ্র হেবোর উইল চুরির কথা শুনে রীতিমতো অবাক! বললেন, 'এ হতেই পারে না! আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই যে, ঐ ঘড়েল শিরোমণি লোহার সিন্দুকে উইল রেখে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে—আর যাওয়ার সময় সেই চাবির থোকাটা রেখে যাবে হেবোর ঘরেই। হেবোর মত শেয়ানা ছেলে ও কথা বিশ্বাস করল কেমন করে?'

হো-হো করে হেসে উঠে প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'নিয়ে আসুন সেখানা, খুলে দেখুন ভিতরে কী মাল আছে! ওখানা আসল উইল নিশ্চয় নয়। হেবোকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ওখানা ঐ হতভাগা বোম্বেটে ওখানে রেখে গেছে। আসল উইল সে সঙ্গে নিয়েই গেছে।'

হেবোর কাকা বলেন, 'আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল।'

বাধা দিয়ে প্রবীর বলেন, 'সন্দেহ হয়েছিল না ঘণ্টা! তাহলে এতক্ষণ সেটা খুলে দেখেন নি কেন?'

'হেবোই তো বারণ করলে।'

'বাদ দিন ওসব ছেলেমানুষী! নিয়ে আসুন সেখানা।'

কাকিমা ভয়ে ভয়ে আলমারি খুলে বন্ধ খামটা নিয়ে আসেন। সীলমোহরগুলি পরীক্ষা করে প্রবীরবাবু বলেন, সীল ঠিকই আছে, তবে ভিতরে কী আছে জানেন?

'সাদা কাগজ?'

'মোটেই নয়। ভিতরে আছে আসল উইলের একটা হুবহু কপি। শুধু, সইগুলো জাল। বেটা জানে যে হেবো এটা চুরি করবে এবং পুড়িয়ে ফেলবে। তারপর সুধাকান্তের মৃত্যু হলে আমরা যখন বলব তিনি কখনও কোন উইল করেননি, তখন সকলের নাকের উপর আসল উইলখানা মেলে ধরবেন তিনি।'

কাকা বলেন, 'তবে এখানা খুলে দেখি?'

'নিশ্চয়ই।' বলে প্রবীরচন্দ্র খুলে ফেলেন খামটা। কাগজের ভাঁজটা খুলে মুখটা লাল হয়ে যায় তাঁর। তাঁর অনুমান সত্য হয়নি। কাগজখানা মেলে ধরেন তিনি। কাগজটায় লেখা ছিল—

'দুঃখ কোরো না বাবা হেবো—থুড়ি বটুক! হেলে ধরতে হাত পাকিয়েছ বলে কেউটের গর্তে হাত দিতে যেও না। কাগজখানা সিন্দুকে রেখে যাওয়া নিরাপদ নয় মনে করে সেটা সঙ্গে করেই নিয়ে গেলাম। পবুকে দুঃখ করতে বারণ কর।'

কাকা চিৎকার করে ওঠেন—'ছি ছি ছি! হেবোটা একটা আস্ত গাড়োল!'

প্রবীর বলেন, 'আপনারাও কিছু কম যান না!'

মুখ কালো করে বসে থাকেন কাকা।

কাকিমা বলেন, 'সে যা হবার হয়েছে। তোমাদের বুদ্ধি যে কত তা বোঝা গেছে! একরত্তি একটা ছেলেকে ঠেলে দিয়ে এখানে বসে সবাই ল্যাজ নাড়ছ! এতক্ষণে বোধহয় মঞ্জুলাকে ঐ গুরুদেব হাত ধরে পথে বার করে দিয়েছে! চল তাকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করি।'

আগত্যা কাকা-কাকিমা আর প্রবীরচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে রওনা হলেন কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে।

সুধাকান্তের বাড়িতে পৌঁছে দেখেন, রীতিমত একটা জনসমাবেশ হয়েছে। সুধাকান্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। শহরের গণ্যমান্য সকলেই এসে হাজির হয়েছেন। মৃতদেহ দাহ করে শ্মশানযাত্রীরাও ফিরে এসেছে।

বাইরের ঘরে বসে কথা হচ্ছে। গুরুদেব ইতিমধ্যে এসে জুটেছেন। হেবোও আছে। শহরের প্রবীন উকিল গণেশবাবু বলছেন, 'শহরে একটা ইন্দ্রপতন হয়ে গেল! সুধাকান্তবাবুর সওয়াল শুনতে বার অ্যাসোসিয়েশন ছেড়ে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ত।'

'অত্যন্ত ক্ষুরধার বুদ্ধি ছিল ওঁর,' নবীন একজন উকিল বলেন, 'অথচ সেই মানুষেরই শেষ অবস্থায় কী ভীষণ বুদ্ধিভ্রংশ হল দেখুন।'

গণেশবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, 'মুনিদেরও মতিভ্রম হয় হে ঘোষাল, তা সুধাকান্তবাবু তো সামান্য মানুষ।'

জগন্নাথবাবু বলেন, 'কেন? মতিভ্রম কিসের?'

গণেশবাবু বলেন, 'ও, আপনি বুঝি জানেন না? সুধাকান্তবাবু একেবারে শেষ অবস্থায় উইল পালটিয়ে তাঁর বিধবা পুত্রবধূকে সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে গেছেন।

জগন্নাথবাবুও নামকরা প্রবীণ উকিল, সুধাকান্তের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল যথেষ্টই। তিনি বলে ওঠেন, 'এ হতেই পারে না! কী নকুলবাবু, এ কথা কি সত্যি?'

নকুলবাবুর সঙ্গে হেবোর চোখাচোখি হয়। হেবোর সঙ্গে তাঁর বোধহয় আগেই কোন কথা হয়ে থাকবে। তিনি অম্লানবদনে বলে বসেন, 'এঁরা অনেকে তাই বলছেন বটে, তবে আমার তো বিশ্বাস হয় না! তাহলে আমাকে তিনি নিশ্চয়ই বলে যেতেন।'

গুরুদেব ফোড়ন কাটেন, 'অথবা সাক্ষী রাখতেন। আপনি কি তাঁর শেষ উইলে গত শুক্রবার সই করেননি?'

'শুক্রবার? কই? মনে তো পড়ে না।'

গুরুদেব হেসে বলেন, 'আমি শুনেছি উইলে আপনারও সই আছে।'

নকুল বলেন, 'ভুল শুনেছেন তাহলে।'

'তা হবে! হস্তরেখাবিদ সে কথা বলতে পারবে।'

হঠাৎ বাধা দিয়ে অ্যাডভোকেট দে-সাহেব বলে ওঠেন, 'না। শেষ সময়ে অর্থাৎ গত শুক্রবার তিনি যে উইল করেছিলেন আমি সে উইলে সাক্ষী হিসাবে সই করেছি আর—

'আর?'

'আর, জানি না নকুলবাবু কেন অস্বীকার করছেন, তিনি আমার সম্মুখেই সাক্ষী হিসাবে সই দিয়েছিলেন।'

গণেশবাবু বলেন, 'একি সর্বনাশের কথা মশাই! হ্যাঁ নকুলবাবু, ইনি কী বলছেন?'

নকুলবাবু আবার একবার হেবোর দিকে দেখে নিয়ে বলেন, 'বেশ তো উইলটা আনা হলেই বোঝা যাবে।'

হেবো উপর-পড়া হয়ে বলে, 'উইল করে থাকলে সুধাকান্তবাবু তা তাঁর লোহার সিন্দুকে রেখে থাকবেন, না-কি বলেন গুরুদেব?

গুরুদেব বলেন, 'তা তো বলতে পারি না বাবা, তবে আমার কাছে ঐ সিন্দুকের চাবি আছে। খুঁজে দেখতে পার।'

চাবিটা তিনি দেন হেবোর হাতে।

হেবো হেসে বলে, 'বেশ, আপনারাও তাহলে চলুন, সিন্দুকটা আমরা প্রথমে খুঁজে দেখি।'

প্রবীরবাবু বুঝতে পারেন হেবো একটা প্রকাণ্ড ভুল করতে চলেছে। তাই হেবোকে ডেকে বলেন, 'হেবো, শোন। তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল।'

হেবো বললে, 'আসছি প্রবীরকাকা, আগে সিন্দুকটা খুলে দেখে আসি।'

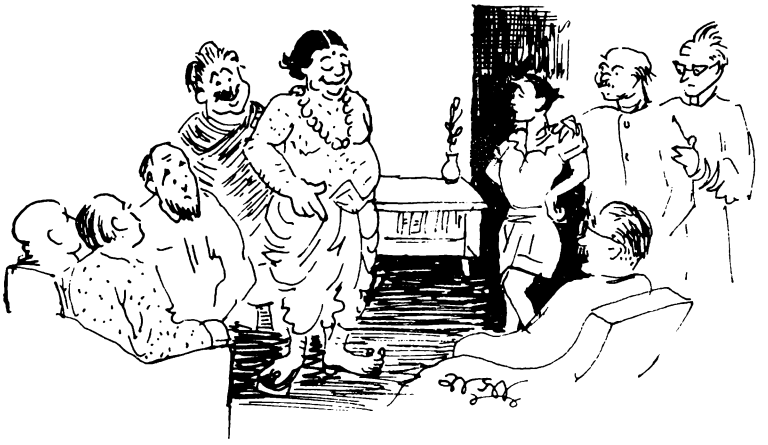

হেবোর কাকা প্রবীরচন্দ্রকে জনান্তিকে ডেকে বলেন, 'বাধা দিও না। যা হবার তা তো হয়েছেই। ওর ডেঁপোমির একটু শিক্ষা হওয়া উচিত!'

সদলবলে ওঁরা উঠে আসেন। হেবো ঝুঁকে পড়ে সিন্দুকটা খুলে ফেলে। ভিতরটা ভাল করে দেখে বলে, 'কই উইল বলে তো কিছু মনে হচ্ছে না। গুরুদেব, আপনি একটু খুঁজে দেখবেন?'

গুরুদেব বলেন, 'না বাবা। আমি তো বলি নি উইল ওখানে আছে। তুমিই বলেছিলে।'

'তবে উইল কোথায় আছে?'— চালের মাথায় প্রশ্ন করে হেবো।

'আমার কাছে বাবা। এই দেখ!'

ঝোলার ভিতর থেকে ঠিক একই রকমের একখানি সীলমোহর-করা খাম বার করে তিনি গণেশবাবুর হাতে দেন।

গণেশবাবু সেটি গ্রহণ করে বলেন, 'এইটিই তাহলে সুধাকান্তের শেষ উইল?'

গুরুদেব হেসে বলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। খুলে দেখুন। সমস্ত সম্পত্তিই তিনি দেবোত্তর করে গেছেন। আমিই তার অছি। তিনজন সাক্ষী আছেন—এবং নকুলচন্দ্র তাঁদের মধ্যে একজন।'

গণেশবাবু বলেন, 'নকুলবাবু?'

নকুলবাবুর চক্ষুস্থির হয়ে গেছে ততক্ষণে। আমতা আমতা করে বলেন—'হেবো!'

হেবো একেবারে পাথরের মূর্তি। কথা নেই মুখে।

গণেশবাবু খামটা খুলবার উদ্যোগ করতেই হেবো বাধা দেয়। বলে, 'এতই যদি হল, তবে গুরুদেব আপনিই খামটা খুলুন। উইলটা পড়ে শোনান আমাদের।'

গুরুদেবের চোখদুটো ধ্বক করে জ্বলে ওঠে। বলেন, 'বেশ, তাই পড়ে শোনাচ্ছি আমি।'

সাবধানে খামটা খুলে ফেলেন তিনি।

কাগজখানা বার করে ভাঁজটা খুলেই কিন্তু চমকে ওঠেন।

এপিঠ-ওপিঠ কয়েকবার দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান।

অ্যাডভোকেট দে-সাহেব ঝুঁকে পড়েন কাগজটার উপর। তারপর বলেন—'একি!'

গণেশবাবু বলেন, 'কি হল? ব্যাপার কি?'

গুরুদেবের অবশ হাত থেকে কাগজখানা টেনে নিয়ে এপিঠ-ওপিঠ দেখে বলেন, 'এ তো একখণ্ড সাদা কাগজ। উইল কই?'

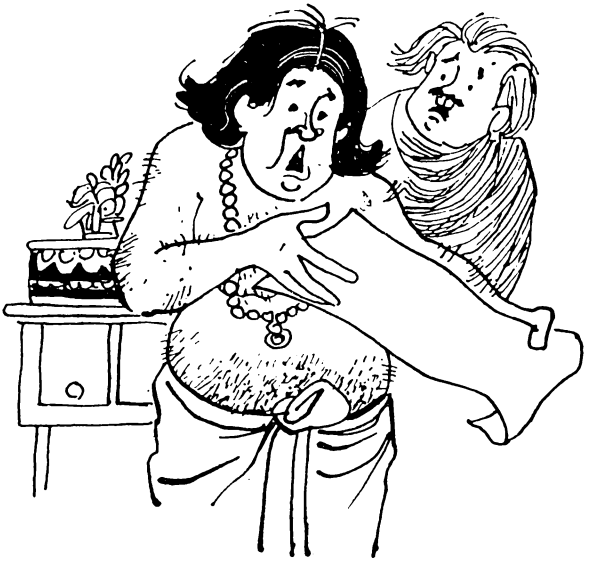

গুরুদেব কোন জবাব দেন না। গোল মুখখানা লম্বাটে হয়ে গেছে তাঁর। চোয়ালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়েছে।

হেবো খুক-খুক করে হেসে ওঠে। আর আত্মসংবরন করতে পারেন না গুরুদেব। ধপ করে বসে পড়েন মাটিতে। গণেশবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'কি হল?'

হেবো গম্ভীরভাবে বলে, 'আজ্ঞে জয়দ্রথ বধ!'

* * *

সুধাকান্তের শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করা হবে স্থির হল। মঞ্জুলা দেবী ঘটা করে শ্রাদ্ধ করতে চান। শ্বশুর তো তাঁর জন্য সম্পত্তি বড় কম রেখে যাননি! ভাল করেই খরচ-পত্র করতে মনস্থ করেছেন তিনি।

পরদিনই তল্পি-তল্পা গুটিয়ে গুরুদেব রওনা হচ্ছেন শুনে হেবো ছুটে এল সিঁড়ির মুখে। দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনার শ্রাদ্ধের গুরুবিদায়টা নিয়ে যাবেন না স্যর?'

গুরুদেব শুধু বললেন, 'জ্যাঠামো কোরো না!'

হেবো বললে, 'অন্তত এ দুটো নিয়ে যান। খুঁজে পাওয়া গেছে। এদুটো আপনারই।' হেবো বার করে দেয় একটা রুপোর কোশাকুশি আর একটা কলম।

গুরুবিদায় সমাপ্ত হতেই বাড়ির সকলে ঘিরে ধরল হেবোকে। কাকা, কাকিমা, মঞ্জুলা,

নকুলচন্দ্র আর প্রবীর। দরজা বন্ধ করে সবাই মিলে চেপে ধরল হেবোকে। এবার বলতে হবে, কি-করে কি হল।

প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!'

হেবো হেসে বলে, 'কেন পারছেন না জানেন? আপনারা সবচেয়ে সহজ পথটা দেখতে পারছেন না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, তাহলেই সমস্যাটা সহজ হয়ে যাবে।'

'কী উদাহরণ?'

'আপনাকে তিনটে বানান জিজ্ঞাসা করব। ঠিক খেয়াল করে বানান তিনটে বলুন দেখি?'

'বেশ, বল।'

'প্রথম বানান মুমূর্ষু।'

'ম-য়ে হ্রস্বউ, ম-য়ে দীর্ঘঊ আর মূর্ধণ্যষ-এ রেফ হ্রস্বউ।'

হেবো বললে, 'ঠিক। এবার বলুন—মুহূর্ত।'

'ম-য়ে হ্রস্বউ, হ-য়ে দীর্ঘঊ আর ত-য়ে রেফ।'

হেবো বললে—'ভুল।'

প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'না হে, ভুল নয়। এখনকার বানান তয়ে রেফ। আগে ছিল তয়ে-তয়ে রেফ।'

হেবো আবার বললে—'ভুল।'

প্রবীরচন্দ্র চটে উঠে বলেন, 'তবে, তুমি ঠিক বানানটা বল শুনি!'

হেবো বললে, 'ভ-য়ে হ্রস্বউ আর ল।'

থমকে গিয়ে প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'তার মানে?'

'তার মানে, প্রথম দুটি বানান আপনার ঠিকই হয়েছে। তৃতীয় বানান যেটা আমি জানতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে—"ভুল"; আপনি বলতে পারছিলেন না।'

হোহো করে হেসে ওঠে সবাই।

প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'স্বীকার করছি, ঠকে গেছি।'

হেবো বললে, 'গুরুদেবও ঠিক ঐভাবেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি ঠকে গেছেন। গুরুদেব ভেবেছিলেন উইলটা চুরি করতেই আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করব। তাই টোপ ফেলে চার ছড়িয়ে বঁড়শি ছিপ হাতে বসেছিলেন উনি। আসল উইলটা সঙ্গে নিয়ে একটা নকল উইল সিন্দুকে রেখে এবং চাবিটা ফেলে গেলেন। গুরুদেব ভেবেছিলেন নকল উইলটা চুরি করে বোকা হব আমি। কিন্তু উনি যান ডালে ডালে তো আমি যাই পাতায় পাতায়। সব জেনে-শুনেও সেই নকল উইল চুরি করলাম আমি। বোকা সাজলাম।'

বাধা দিয়ে প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'সে তো বুঝলাম। কিন্তু আসল উইলটা কোথায় গেল?'

'কেন, যেখানা গুরুদেব পরে বার করলেন।'

'সেটা তো সাদা কাগজ!'

হেবো হেসে বললে, সেখানাই আসল উইল। আমি কলকাতা গিয়ে কাকিমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিছু মাল-মশলা কিনি। একটা কালো পাইলট কলম, কিছু স্টার্চ আর আইওডিন। স্টার্চের সল্যুশানে কয়েক ফোঁটা আইওডিন ফেলে দিলে ব্লু-ব্ল্যাক রঙের কালি হয়। কিন্তু সেটা ম্যাজিক কালি; কিছু পরেই লেখা উপে যায়। কাগজে কোন দাগ থাকে না। উইল করার আগের দিন যখন ক্যাবল গেল ডাক্তারবাবুর ব্যাগ আনতে তখন ঐ কালি-ভর্তি

কলমটা আমি কলমদানিতে রেখে দিই। আগের রাত্রেই বাড়ির অন্যান্য ফাউন্টেন পেন চুরি গেছে। ফলে আশা করছিলাম ঐ কলমেই উইল লেখা হবে। একমাত্র ভয় ছিল—অ্যাডভোকেট-সাহেব যদি শেষ মুহূর্তে তাঁর পকেট থেকে কলম বার করে বসেন। কিন্তু আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। সম্পত্তির কণামাত্র না পেয়েও যখন কাকিমা তাঁর শ্বশুরের সেবা করতে গেলেন তখন ডাক্তারবাবু রাগ করে বলেছিলেন—তোমার কথায় ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি মা! আর ঠিক তখনই আমার মনে হয়েছিল—ভগবান আমার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। সবাই ঐ কলমেই সই দিয়েছেন।'

কাকা বলেন, 'কিন্তু ডাক্তারবাবুও কি তাঁর নিজের কলমে সই করেননি?'

নকুলবাবু বলেন, 'না, নিয়ম হচ্ছে দলিলে সকলে একই কলমে সই করবে—যাতে প্রমাণ হয় সাক্ষীরা দলিলকারীর সঙ্গে একই স্থানে, একই সময়ে সই করেছেন। এ নিয়ম খুব কঠোরভাবে মানা হয় না; কিন্তু সুধাকান্তবাবু পাকা উকিল, আইনের খুঁত তিনি রাখবেন না। তাই আমি আর ডাক্তারবাবু যখন দ্বিতীয়বার সই দিতে ফিরে গেলাম তখন তিনি তাঁর কলমটা এগিয়ে দিয়েছিলেন।

মঞ্জুলা দেবী বলেন, 'হেবো, তাই বুঝি তুমি ডাক্তারবাবুকে সই করতে পীড়াপীড়ি করছিলে?'

হেবো বলে, 'ঐ মুহূর্তটাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ। ডাক্তারবাবু যদি সই না দিতেন, তাহলে এঁরা দ্বিতীয় ডাক্তারকে ডাকতে যেতেন—ফলে উইল তখনই সীলমোহর করা হত না। আর ঘণ্টাকয়েক পর দ্বিতীয় ডাক্তারবাবু যখন সই দিতে আসতেন ততক্ষণে লেখা সব আবছা হয়ে যেত। ধরা পড়ে যেতাম আমি।'

প্রবীরচন্দ্র ওকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'সাবাস হেবো! বাঙলা সিনেমার তুমি ক্ষুদে নায়ক হতে পার!'

শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিল হেবো। মঞ্জুলা দেবী ওকে কাছে ডেকে বলেন, 'শ্রাদ্ধের পর পণ্ডিতবিদায় করতে হয়। তুমি একটি ক্ষুদে পণ্ডিত! এই তোমার পণ্ডিতবিদায়।'

ছোট্ট একটা বাইনোকুলার। অত্যন্ত জোরালো তার লেন্স। বহু দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়। হেবো জানলার কাছে সরে এসে দেখল, রাস্তার ওপারে যে ভদ্রলোক চায়ের দোকানে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, তার হরফগুলো পর্যন্ত পড়া যাচ্ছে।

জয়দ্রথ-বধ পালা বৃষোৎসর্গে শেষ হওয়ায় হেবো আগেই আহ্লাদে আটখানা হয়েছিল, বাইনোকুলারটা হাতে পেয়ে সে যেন ষোলখানা হয়ে গেল।

আদি পর্ব

কলকাতায় ফিরে এসে হেবো দেখে যথারীতি তার নামে একখানা সীলবন্ধ চিঠি এসেছে। খামটা না খুলেই বুঝতে পারে এটা কার লেখা। আশ্চর্য ভদ্রলোকের ধৈর্য! প্রতিবার হেবো সাফল্যমণ্ডিত হয়, আর উনি ফোড়ন কাটেন। অসহ্য!

ও! তোমরা বুঝি বুঝতে পারছ না? না, দোষ তোমাদের নয়, আমারই। রাম-জন্মের আগেই রামায়ণের কাহিনী ফেঁদে ফেলেছি আমি। 'গুরুবিদায় পর্ব'টা হেবোর জীবনে এসেছে অনেক পরে। ডাক্তার ওয়াটসনের মত তোমরা যদি কেউ ওর কীর্তিকাহিনী ভবিষ্যতে কখনও লিখতে চাও তবে আমার মত উল্টোপাল্টা করে লিখো না। আগের কথা আগেই লিখো। চিঠিখানা কোথা থেকে এসেছে, এবং খাম না খুলেই হেবো কেমন করে তার অন্তর্নিহিত জ্বালা অনুভব করল, তাহলে এবার সেই গোড়ার কথাগুলো বলতে হয়। কেমন কেমন করে হেবো গোয়েন্দা হয়ে উঠল।

হেবোর বর্তমান বয়স ষোল। এবার হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দেবে সে। কিন্তু গোয়েন্দাগিরির ভূত তার ঘাড়ে চেপেছে যখন সে ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়ে। এই তিন-চার

বছরের ভিতরেই সে একের পর এক কয়েকটি মারাত্মক রহস্যের কিনারা করে ফেলেছে। আমার তো ধারণা বড় হলে ওর নাম ও-দেশের শার্লক হোমস্, ইয়ারকুল প্যোরো, আর এ-দেশের ব্যোমকেশ বক্সী, পরাশর বর্মা, জয়ন্ত অথবা কিরীটী রায়ের সঙ্গে একই সঙ্গে

উচ্চারিত হবে—মানে তোমরা যদি কেউ ওয়াটসনের ভূমিকা নিতে রাজি হও। তাই তোমাদের সুবিধা হবে মনে করে ওর গোয়েন্দা-জীবনের আদি কথাটা এবার বলে রাখি।

আগেই বলেছি, গোয়েন্দাগিরির যাবতীয় সরঞ্জাম সে ছেলেবেলা থেকেই সংগ্রহ করে রেখেছিল তার বাক্সে। জমিয়ে রেখেছিল। মেজদির সেলাইয়ের বাক্স থেকে একটা মাপবার ফিতে, দাদুর বাতিল-করা চশমার একটা পুরু লেন্স, একটা মোটা নোটবই। নোটবইতে সময়ে অসময়ে সে নানান তথ্য টুকে রাখত। কোন সমস্যার ক্লু কোন সূত্রে প্রয়োজন হবে তা কে জানে? ঐ নোট বইটা নিয়ে মেজদা ওকে কত ঠাট্টাই না করেছে! সবার সামনে ঠাট্টা করে বলত হেবোর নোটবইতে সব খবরই লেখা আছে, শুধু লেখা নেই—'পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়।'

হেবো রাগ করত না। সে জানত তার দিনও একদিন আসবে। এলও তাই, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে।

হেবোর মেজদির বিয়ে হয়েছিল মাসকতক আগে। হেবো তখন ক্লাস সিক্সে পড়ে। পুজোর সময় মেজদির শ্বশুরবাড়ি তত্ত্ব পাঠানো হবে। বাবা আর কাকা বাজার উজাড় করে পুজোর তত্ত্ব সওদা করে আনলেন। গোল বাধল জুতোজোড়া নিয়ে। জামাকাপড়গুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে হেবোর মা বলেন—'জুতোজোড়া মনে হচ্ছে খুকির পায়ে বড় হবে।'

মেজদা সেটা নেড়ে-চেড়ে পরীক্ষা করে বলে—'বড় নয় মা, ছোটই হবে —এই দেখ আমার পায়েই ছোট হচ্ছে।'

কাকা বলেন—'আমারও তাই মনে হয়েছিল। দাদাকে বললাম আর এক সাইজ বড় নাও বরং তা দাদা—'

বাধা দিয়ে হেবোর বাবা বলে ওঠেন—'আরে না, ওর চেয়ে বড় হলে খুকি উল্টে পড়ে যাবে।'

ক্রমে দেখা গেল আন্দাজে-কেনা জুতোর মাপ সম্বন্ধে বাড়ির প্রত্যেকের মতামত বিভিন্ন প্রকারের। বাড়ির সবাই যেন বিধানসভায় ভোট দিচ্ছেন—একদল সরকারী পক্ষ, একদল বিরোধী পক্ষ। মেজদা হেসে বলে—শ্রীমান শার্লক হেবো এ বিষয়ে কী বলেন? তিনি তাঁর কাস্টিং ভোটটা এবার দিলেই পারেন!'

এই সুযোগ! হেবো কোন কথা বলল না, সোজা উঠে গেল নিজের পড়ার ঘরে। ফিরে এল একটু পরেই। হাতে তার নোট বুক। বিধানসভার স্পীকারের মতই গম্ভীর স্বরে বললে—'আন্দাজে কথা বলা শার্লক হেবোর ধাতে নেই। আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। জুতো মেজদির পায়ে ঠিক হবে।'

নোটবইটা সে মেলে ধরে সকলের সামনে। মেজদির বিয়ের সময় যে জুতোজোড়া কেনা হয়েছিল—তার নম্বর টুকে রাখা আছে ওর নোটবইতে দু-মাস আগে। কাকা বলেন—'ভাগ্যিস হেবোর নোটবইটা ছিল!'

হেবোর গোঁফ নেই, —ওঠেনি নইলে এই সময় সে মেজদার দিকে তাকিয়ে গোঁফে চারা দিত।

ক্লাসের ছেলেরা, পাড়ার বন্ধুরা, প্রায় বাড়ির সবাই মেনে নিয়েছে হেবো একটি হবু-গোয়েন্দা। বাঙলার ভবিষ্যৎ শার্লক হোমস্। একমাত্র মেজদাই সেটা মেনে নিতে রাজি নয়। হেবোর চেয়ে সে দু বছরের বড়—সেবার তার পরীক্ষার বছর। হিউম্যানিটিজ গ্রুপে হায়ার সেকেণ্ডারি। হেবোকে সে মনে করে নেহাত নাবালক। হেবোর গোয়েন্দাগিরির উপর কখনও তার অহৈতুকী উষ্মা, কখনও বা দাদা-সুলভ তাচ্ছিল্য। বাবা-কাকার সুরে সুর মিলিয়ে হেবোকে কখনও উপদেশ দেয়—'এসব ছেলেমানুষী ছেড়ে দে হেবো, নইলে বেঘোরে ফেল্লু মারবি।' কখনও বা লুকিয়ে গিয়ে মায়ের কাছে চুকলি কাটে—'মা, হেবো আবার ডিটেকটিভ বই পড়ছিল!' ঠাট্টা করে মেজদাই ওর এই নামকরণটা করেছে—শার্লক হেবো। হেবোর অবশ্য তাতে দুঃখ নেই। সে জানে ঐ বিদ্রূপের নামই সে একদিন সার্থক করে তুলবে। ঐ নামই হবে তার গৌরবের পরিচয়। তাছাড়া মেজদা যে কেন এতটা চটেছে তাও তো আর অজানা নেই। সে একটা ভারি মজার গল্প।

পৌষ-সংক্রান্তির আগের দিন। মা, কাকিমা আর মেজদি মিলে সারাটা দুপুর ধরে নানান রকম পিঠে তৈরি করেছে। হেবোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে কিছুই হবার উপায় নেই। বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রী। হেবো জানে, চার রকমের মিষ্টি হয়েছে—গোকুল পিঠে, রসবড়, পুলি-পিঠে আর সরুচকলি। সংখ্যায় কোন জাতের কতটি তৈরি হয়েছে তারও মোটামুটি হিসেব লেখা আছে ওর নোটবইতে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই—লোভ তার কিঞ্চিৎ হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তো হ্যাংলার মত চাইতে পারে না! হেবো তাই অন্য একটি যুক্তির অবতারণা করে বলেছিল—'আরে মেজদি, একটার পর একটা বানিয়ে তো যাচ্ছ— একটু টেস্ট করে দেখা তো উচিত—মানে, ঠিকমত ভেতরে রস ঢুকছে কি না—'

কাকিমা এ যুক্তি তে হেসে ফেলেছিল। তবু হয়ত দুটো রসবড় ওকে পরখ করতে তুলেদিতেন; কিন্তু মা মেজদির ভোটাধিক্যে ওর প্রস্তাবটা পাশ হল না। মা বললেন—'সে আর তোকে নতুন করে দেখতে হবে না। এইমাত্র তোর মেজদা পরখ করে বলে গেল।'

যুক্তির বাইরে যেতে পারে না হেবো। অগত্যা ওকে ঢোক গিলে যেতে হয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে বার-বার ঐ পিঠেগুলোর কথাই ওর মনে হয়েছে, ঘুম আসার আগে পর্যন্ত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্নও দেখল, পুলি-পিঠেগুলোর গায়ে লেত্তি জড়িয়ে মেজদা গচ্ছা-গচ্ছি খেলছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল হেবোর। রাত তখন নিষুতি। সমস্ত বাড়িটা ঘুমোচ্ছে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই, মাঝের হল-কামরার বড় ঘড়িটার টক-টক ছাড়া। হেবোর হঠাৎ মনে হল ভাঁড়ার ঘর থেকে যেন একটা সন্দেহজনক শব্দ আসছে, বাসনপত্র সরানোর শব্দ। কিছুদিন আগেই পাড়ায় মিঠুয়াদের বাড়ি চুরি হয়ে গেছে। সে-চুরির কিনারা হয়নি। পুলিসে খামোখা মিঠুয়াদের নতুন চাকরটাকে ধরে নিয়ে গেছে। একেই চুরিতে বিপদগ্রস্ত, তার উপর চাকরটাও বেহাত হওয়ায় মিঠুয়ার মায়ের অবস্থা চরমে উঠেছে। হেবো সব খবরই রাখে।

বাসনপত্র সরানোর আওয়াজ শুনেই হেবো বুঝতে পারে ব্যাপারখানা। এ নিশ্চয়ই সেই সিঁধেল চোরের কাণ্ড। জন্ম-ডিটেকটিভ শার্লক হেবো! তড়াক করে খাট থেকে নেমে পড়ে সে। খাটের নিচে থেকে টেনে নেয় হকিষ্টিকটা। ধরতেই হবে বাছাধনকে এবার! পা টিপে-টিপে সাহসে ভর করে একাই এগিয়ে গেল সে ভাঁড়ার-ঘরের দিকে। প্যাসেজের আলোটা ইচ্ছা করে জ্বালে না। চোর যেন টের না পায়। পাগলা দাশুদের স্কুলে কে যেন একবার চোর ধরতে গিয়ে বেড়াল ধরে নাকাল হয়েছিল। হেবো সে ভুল করবে না। অতি সন্তর্পণে সে উঁকি দিয়ে দেখল ভাঁড়ার-ঘরের আধ-ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে। ঘর নীরন্ধ্র অন্ধকার—তবু মনে হল একটা মানুষ মোড়ার উপর দাঁড়িয়ে উপরের তাক থেকে কিছু পেড়ে নামাচ্ছে। কী আবার? বাসনপত্র নিশ্চয়ই! হেবো সাবধানী—সে জানে চেঁচিয়ে উঠলে অথবা আলো জ্বাললে চোর তাকে ধাক্কা মেরে ছুটে পালিয়ে যাবে! তার হাতে হকিষ্টিক আছে বটে, কিন্তু চোরের হাতে যে ছোরা অথবা রিভলভার নেই, তারই বা নিশ্চয়তা কি? ছেলেমানুষকে কাবু করে পালিয়ে যাওয়া একটা জোয়ান মানুষের পক্ষে কিছু না। কিন্তু বয়সে ছোট হলে কি হবে? মদোন্মত্তের চেয়ে শশক বয়সে বড় ছিল এমন প্রমাণ নেই। হেবো জানে ভাড়ার-ঘরে এই একটিমাত্র দরজা। ও-পাশের জানলায় গরাদ দেওয়া আছে। হেবো আর মুহূর্তমাত্র দেরি করে না; চট করে ভাঁড়ার-ঘরের দরজায় শিকলটা তুলে দেয়। ব্যাস, বাছাধন এবার ইঁদুরের জাঁতাকলে বন্দী! এখন রিভলভারই হোক আর ছোরাই হোক, হেবোর হাতে ওর নিষ্কৃতি নেই। পরমুহূর্তেই হেবোর গগনবিদারী চিৎকারে বাড়ির নৈশ নিস্তব্ধতা খান-খান হয়ে যায়—'চোর! চোর!! চোর!!!'

ছুটে এল বাড়ি-সুদ্ধ সবাই। বাবা-মা-কাকা-কাকিমা মায় ছট্টুলাল আর বামুনদি। লাঠিটা বাগিয়ে ধরে ছট্টুলাল এসে মহড়া নিল দরজার সামনে। সারা বাড়ির আলো তখন জ্বলে উঠেছে। ছট্টুলাল দরজার শিকলে হাত দিয়ে তার দেহাতি ভাষায় চিৎকার করে বললে পালাবার চেষ্টা করলে কিন্তু মাথা ফাটিয়ে দিতে পিছপাও হবে না সে!

কাকা বলেন—'দরকার কি ছট্টুলাল? দরজা বন্ধই থাক! আগে পুলিসে খবর পাঠানো যাক।'

ছট্টুলাল তার গোঁফের প্রান্তে চাড়া দিয়ে বললে, এমন কলে-পড়া ইঁদুর যদি তার হাত ফসকে পালায় তবে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাজুবন্ধ পরে সে ফিরে যাবে ছাপরা জেলায়! —'আপ, দেখিয়ে না হুজুর, ক্যা হাল করে! সালা চোট্টাকো হাম ছাতু বনা দেউঙ্গা!'

শিকল খুলে দিয়ে, লাঠিটা বাগিয়ে ধরে দড়াম করে দরজাটা সে খুলে দেয়।

বের হয়ে এলেন রসবড়া-রসাপ্লুত মেজদা!

সে অপমান মেজদা ভুলতে পারেনি। তোমারাই বল, সে লজ্জার কথা কি ভোলা যায়? একবাড়ি লোকের সামনে রাত দুটোর সময় চোর বলে ধরা পড়াই শুধু নয়, সেই পৌষ মাসের শীতে মধ্যরাত্রিতে বেচারিকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হয়েছিল। তাড়াহুড়োয় রসবড়ার মাটির হাঁড়িটাই উল্টে পড়েছিল ওর মাথায়! ভাঙা হাঁড়ির কানাটা আটকে ছিল গলায়, জয়মাল্যের মত।

তাই মেজদার যত আক্রোশ হেবোর উপর। ভ্রূক্ষেপ করে না হেবো। চোর সে ঠিকই ধরেছিল। বাইরের চোর না হোক, ঘরের চোর, —বাসন চোর না হোক, রসবড়া-চোর।

কিন্তু যে ঘটনার পর থেকে হেবো গোয়েন্দা হিসাবে সকলের কাছে প্রথম স্বীকৃতি পেল, যে ঘটনার তার নাম প্রথম ছাপা হল খবরের কাগজে, এবার সেই ঘটনার কথাই বলব তোমাদের।

সেবার পুজোর ছুটিতে হেবোর বাবা কলকাতার বাইরে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ক'দিন ধরে বাড়িতে নানান জল্পনা-কল্পনা। মধুপুর—পুরী—না, দার্জিলিঙ? শেষ-বেশ স্থির হল, না ওসব কিছু নয়, যাওয়া হবে বাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শণ করতে। বেনারস। হেবোর ফূর্তি দেখে কে! বহুদিন বাঙলার বাইরে যায়নি ওরা। রেলগাড়ি খোলা প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হু-হু করে ছুটছে—আর জানলায় মাথা রেখে বসে আছে হেবো, এটা ভাবলেই একটা শিহরণ লাগে। ঠিক হল বাবা-মা-মেজদা আর হেবো যাবে কাশীতে। কাকা যাবেন কাকিমাকে নিয়ে কাকিমার বাপের বাড়ি মালদায়। ছট্টুলাল থাকবে বাড়ির তদারকে। হেবো তাকে নানারকমভাবে তালিম দিয়ে শিখিয়ে দিল খালি বাড়ি কেমনভাবে পাহারা দিতে হবে।

তার পর স্কুলের ছুটি হলে নির্দিষ্ট দিনে ওদের স্টেশনে তুলে দিতে এলেন কাকা-কাকিমা। আলোয় আলো হাওড়া স্টেশন। দেরাদুন এক্সপ্রেসটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে। অসম্ভব ভিড় হয়েছে। পুজোর সময় যেমন হয় আর কি। ওদের কামরায় অবশ্য ভিড় হয়নি মোটেই। রিজার্ভ কামরা। অর্থাৎ কামরাটায় যতগুলো সীট আছে ঠিক ততগুলো রিজার্ভেশন টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। হেবো লক্ষ্য করে দেখে রেলের কামরায় লেখা আছে—'বারো জন বসিবেক।' গুণে দেখল বারোজন লোকই আছে বটে। কিন্তু তারপরই লক্ষ্য হল রেল-কোম্পানির আর একটি বিজ্ঞপ্তিঃ

'চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে।'

আপন মনেই হাসল হেবো। কী বুদ্ধি রেল-কোম্পানির বড় কর্তাদের! আরে বাপু, চোর-জুয়াচোর যে নিকটেই আছে এ সাধারণ সংবাদটা কি শার্লক হেবো জানে না? কিন্তু ঐভাবে প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে চোর-জুয়াচোর-পকেটমারদের সাবধান করে দেবার মানেটা কি? যাই হোক সাবধান সে প্রথম থেকেই হয়ে আছে। স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সব যাত্রীদের সে লক্ষ্য করতে থাকে। সকলেই চোর-জুয়াচোর নয়; কিন্তু বিজ্ঞপ্তি যখন দেওয়া হয়েছে তখন নিশ্চয়ই চোর-জুয়াচোর লুকিয়ে আছে ওদের মধ্যে। কে হতে পারে? অধিকাংশই পশ্চিমা লোক। ওদের পরিবার ছাড়া আরও একটি বাঙালি পরিবার বসেছেন সেই কামরায়। কর্তা-গিন্নী, আর দুটি ছেলেমেয়ে। ও পাশের দূরের ঐ সাধুবাবার উপর কেমন যেন সন্দেহ হয়। ওর দাড়িটা নকল নয় তো? সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ কি আগে থেকে সীট রিজার্ভ করিয়ে রাখে? ও কোন জাতের সাধু তাহলে? তাছাড়া মাঝের বেঞ্চিতে ঐ মধ্যবয়স্ক পাঞ্জাবী লোকটি? তিনিই বা এত রাতে গগলস চোখে দিয়ে আছেন কেন? এঁরও দাড়ি আছে, তার উপর পাগড়ি।

হেবোরা বসেছিল দরজার উল্টো দিকে একটা কোণ ঘেঁষে। সেখান থেকে সকলের উপরেই বেশ নজর রাখা চলে। বর্ধমানে গাড়ি দাঁড়ালো। এ পাশের মারোয়াড়ী ভদ্রলোক সীতাভোগ কিনলেন। আসানসোলে মধ্যরাত্রে উঠল অনেক লোক। শিখ ভদ্রলোক 'রিজার্ভ গাড়ি' বলে দরজা আড়াল করে দাঁড়ালেন; তবু কিছু লোক জোর করে উঠল। 'বারো জন বসিবেক' আইন আর মানা যাচ্ছে না। একজন পশ্চিমা মুসলমান ভদ্রলোক উঠলেন। গায়ে ঘুন্টি-দেওয়া মেরজাই—মাথায় কাজ-করা সাদা টুপি। মেজদা বসেছিল বেঞ্চির প্রান্তে। তাকে ঠেলে-ঠুলে পশ্চিমা ভদ্রলোক বসবার উপক্রম করতেই মেজদা তার বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—'একদম জায়গা নেই দেখতে পাতা নেই? মানুষ কা মুণ্ডুর উপর বসেগা না কি রে বাপু?'

ভদ্রলোক সবিনয়ে বলেন—'জরা মদৎ তো করো ভাইসাব, ঔর এক মুসাফির কে লিয়ে কাফি জগাহ্, হো সক্তা।'

এই সময় শিখ ভদ্রলোক চট করে স্যুটকেসটা নিয়ে নেমে গেলেন। ফলে হেবোর মেজদাকে আর মদৎ করতে হল না—পশ্চিমা ভদ্রলোক মাঝের বেঞ্চিতে ঐ খালি আসনটি দখল করলেন। আরও যারা উঠেছিল এই স্টেশনে তাদের দাঁড়িয়েই থাকতে হল। 'বসিবেক'-এর হিসাবটাই রেল কোম্পানি কষেছে, মাঝপথে ভিড় ঠেলে উঠলে কতজন 'দাঁড়াইবেক' এবং কতজন পাদানি থেকে 'ঝুলিবেক' তার তো আর কোনও হিসাব নেই। শুধু একজন ফতুয়া-পরা ভুঁড়ি-সর্বস্ব ভোজপুরী পশ্চিমা লোক এই এত লোকের ভিড় ঠেলে কায়দা করে উঠে গেল বাঙ্কের উপর। গাড়ি আসানসোল ছাড়ল।

আবার বসে বসে সবাই ঢুলতে শুরু করেছে। কেউ-কেউ বই পড়ছে সেই আধো অন্ধকারে। মাঝের বেঞ্চির মুসলমান ভদ্রলোকটি টেনে নিলেন হেবোর বাবার

'আনন্দবাজার' খানা। জেগে থাকলে হয়ত হেবোর বাবা অবিনাশবাবুর অনুমতি নিতেন তিনি, কিন্তু হেবো দেখল ওর বাবা বসে বসেই ঘুমোচ্ছেন। হেবোর ঘুম আসছিল না। তা ছাড়া আজ রাত্রে সে ঘুমোবে না—ঘুমোনো উচিতও নয়! এই সুযোগে পকেট থেকে হেবো অতি সন্তর্পণে বার করে একখানা চটি বই, 'হত্যাকারী কে?' পড়তে থাকে একমনে। বই পড়ছে বটে, কিন্তু সজাগ দৃষ্টি তার ঠিকই আছে সকলের উপর। শোবার জায়গা বস্তুত কেউই পায়নি, একমাত্র বাঙ্কের উপরের ঐ ভুঁড়িয়াল ভোজপুরীটা ছাড়া। অন্য সকলেই বসে বসে ঢুলছে। নাক ডাকার শব্দ আসছে বাঙ্কের উপর থেকে। অত বড় দেহটাকে কায়দা করে লোকটা ঘুমোচ্ছে কেমন করে? বার-বারই হেবোর নজর যাচ্ছে ঐ বিজ্ঞস্তিটার দিকে—'নিজে টিকিট কেন, মালের উপর নজর রাখ, —চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে।'

জেগেই রাতটা কাটিয়ে দেবে স্থির করেছিল, কিন্তু ওরই মধ্যে কখন একটু ঢুলুনি এসেছে। হঠাৎ একটা বিকট শব্দে চমকে জেগে ওঠে হেবো। গাড়ি তখন একটা টানেলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। টানেলের গুমরানির বিকট শব্দেই ঘুম ভেঙে গেছে ওর। নাঃ, ভয়ের কিছু নেই। তাদের মালপত্র সব ঠিক আছে। ঘুমোচ্ছে সবাই বসে বসেই। শুধু বাঙালি ভদ্রলোকটি জেগে বই পড়ছেন। আর আসানসোল থেকে ওটা সেই ভদ্রলোকটি, যিনি মেজদাকে সরে বসতে বলেছিলেন তিনিও জেগে আছেন—খবরের কাগজটা তখনও দেখছেন। সাধুবাবাও অবশ্য জেগে আছেন, গঞ্জিকা সেবনে ব্যস্ত তিনি। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোলো হেবো।

ঘুম ভাঙল একটা চেঁচামেচিতে। গাড়ি তখন দাঁড়িয়ে আছে গয়া স্টেশনে। ভোর হয়-হয় আর কি। অবাক চোখে হেবো দেখে, কামরাতে উঠেছে দু-জন য়ুনিফর্মধারী পুলিস। আরও দু-জন পুলিস অফিসার উঠেছেন কামরায়। ঐ দিককার বেঞ্চিতে যে বাঙালি ভদ্রলোক সপরিবারে যাচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গে একজন পুলিস অফিসারের কথা-কাটাকাটি হচ্ছে।

ভদ্রলোক বলছেন—'কেন মশাই, বাঙালি হয়ে জন্মেছি বলেই কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি?'

পুলিস অফিসারটি বলছেন—আহ আপনি রাগ করছেন কেন? আমি তো শুধু আপনার নামটাই জিজ্ঞাসা করেছি। আমাদের খবর—লোকটা বাঙালি, তাই জিজ্ঞাসা করছি। কই অবিনাশবাবু তো রাগ করেননি?'

হেবো বুঝতে পারে এর-আগে তার বাবাকেও তাহলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি? একটু চেষ্টা করেই বুঝতে পারে ব্যাপারটা। এরা আবগারি পুলিস—মানে মদ-গাঁজা-আফিং নিয়ে যারা চোরাকারবার করে, তাদের ধরে বেড়ায়। ওরা নাকি খবর পেয়েছে, এই গাড়িতে একজন অনেকদিনের পাকা চোরাকারবারী এক স্যুটকেস আফিং নিয়ে পালাচ্ছে। লোকটা বাঙালি—স্যুটকেস তার সঙ্গেই আছে।

দ্বিতীয় অফিসার প্রথমজনকে বললেন—'এঁদের আর মিথ্যে হয়রানি করে কি হবে

মুখুজ্জে? এঁরা সব ভদ্রলোক, আমার মনে হয় আসানসোলে যে পাঞ্জাবী লোকটা স্যুটকেস হাতে এই কামরা থেকে নেমে গেল,—সেই যে, গগ্‌ল্‌স পরা লোকটা হে—সে-ই আসল ঘাঘি! রাত্রিবেলা গগ্‌ল্‌স দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, বেটা শিখ সেজে চোখে ধুলো দিয়ে গেল।'

মুখার্জি-সাহেব বললেন—'আমারও তাই মনে হয়।'

—'তাহলে আর সময় নষ্ট করে কি হবে, চল যাই।'

—'চলো।'

দু-জন অফিসারই গাড়ি থেকে নেমে এলেন প্ল্যাটফর্মে। হেবো কামরার সকলের উপর একনজর চোখ বুলিয়ে নিল। গণ্ডগোলে সবাই জেগে উঠেছে—একমাত্র বাঙ্কের উপর শায়িত বিশালবপু ভোজপুরী প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হয়নি এত গণ্ডগোলেও। একটানা নাক ডেকে চলেছেন তিনি। মেজদা হেবোকে কনুই এর একটা গুঁতো মেরে বললে—'শার্লক হেবো, একটু এনকোয়ারি করে দেখলে পারতে!'

হেবো জবাব দেয় না। সে তখন গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। একমনে কিসের যেন হিসাব করে যাচ্ছে চোখ বুজে। তারপর, কোথাও কিছু নেই, এক লাফ দিয়ে সে নেমে পড়ে প্ল্যাটফর্মে। হাঁ-হাঁ করে ওঠে গাড়ি-সুদ্ধ লোকজন। আবগারি অফিসার দু-জন ছুটে এসে ওকে ধরে তোলেন। বলেন—'পড়ে গেলে কেমন করে, খোকা?'

'—খোকা নয়,' প্রতিবাদ করে হেবো, —'আমার নাম হেবো, শার্লক হেবো। আর, পড়ে আমি যাইনি, ঝাঁপ দিয়েছি মাত্র। বিপদে ঝাঁপ দেওয়াই আমার স্বভাব। সে যাক। আপনারা ভুল করেছেন, আফিং-চোর এই কামরাতেই আছে। আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

হেবোর বাবা অবিনাশবাবুও নেমে এসেছেন ততক্ষণে। পুলিস অফিসার ভদ্রলোক হেবোকে তার বাবার জিম্মায় পৌঁছে দিয়ে বলেন—'আপনার ছেলে? নিন! তবে এ তুখোড় ছেলেটিকে একটু সামলিয়ে রাখবেন!'

হেবো চিৎকার করে ওঠে—'আমার কথা বিশ্বাস করছেন না আপনারা? আমি আন্দাজে কিছু বলছি না। প্রমাণ আমার হাতে।'

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন অবিনাশবাবু—'কী পাগলামি করছিস হেবো?'

কিন্তু দ্বিতীয় অফিসারটি হঠাৎ বলে বসেন—'বেশ তো, দেখাই যাক না ও কি বলতে চায়। কী বলছ খোকা? আফিং-চোরকে তুমি দেখিয়ে দিতে পারবে?'

হেবো কোন কথা বলে না। গট-গট করে কামরায় ফিরে এসে বলে —'আফিং নিয়ে পালাচ্ছেন এই ভদ্রলোক।'

অম্লানবদনে সে দেখিয়ে দিল মাঝের বেঞ্চিতে বসা সেই মুসলমান ভদ্রলোকটিকে। আসানসোলে উঠে যিনি মেজদাকে সরে বসতে বলছিলেন। তাজ্জব কাণ্ড! হেবোর বাবা আর সামলাতে পারেন না নিজেকে। প্রচণ্ড রাগে হেবোর কানটা ধরে একটা থাপ্পড় বসিয়ে

দিলেন ওর গালে। বাধা দিলেন সেই আবগারি অফিসারটি। বলেন—'আহা গাড়ির মধ্যে আর মারধোর করবেন না। বাড়ি গিয়ে শাসন করবেন বরং।'

মুসলমান ভদ্রলোকটি বোধহয় এদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারেননি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন তিনি। হেবোর গালটা জ্বালা করছে। কানটাও লাল হয়ে উঠেছে। কোনরকমে চোখের জল সামলে সে শুধু বললে—'প্লীজ, আপনারা শুধু ওঁর স্যুটকেসটা খুলে দেখুন!'

মুসলমান ভদ্রলোক বলেন—'হুয়া ক্যা?'

আবগারি দারোগা চলেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কি ভেবে ফিরে আসেন তিনি। স্যুটকেসটার দিকে হাত বাড়াতেই ঘটে গেল একটা তাজ্জব কাণ্ড। চট করে বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়ালো সেই মুসলমান লোকটা। মুহূর্তে পকেট থেকে বার করে ফেলে কালো রঙের একটা ছোট্ট হাতিয়ার। হেবোর কানটা তখনও ধরা আছে অবিনাশবাবুর হাতে। কানে প্রচণ্ড টান লাগছে, তবু হেবো বুঝতে পারে জিনিসটা কী। রহস্য-লহরী সিরিজের অনেক বইতে ছবি দেখা আছে তার।

মুসলমান ভদ্রলোক পরিষ্কার বাঙলা ভাষায় বলে ওঠে—'আমার দিকে যে এক পা এগিয়ে আসবে আমি কিন্তু তার খুলি উড়িয়ে দেব! ছ-টা গুলি ভরা আছে এতে—ছয়জনকে না মেরে ধরা দেব না আমি! দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াও সকলে!'

ঘরে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা। সে নৈঃশব্দ্যের মধ্যে শোনা যাচ্ছে একমাত্র বাঙ্কে-শয়ান ভোজপুরীর নাসিকাধ্বনি।

ট্রেন হুইসিল দিল। পরমুহূর্তেই দুলে উঠল ট্রেনটা। জল আর কয়লা নিয়ে নূতন উদ্যমে ইঞ্জিন গাড়িকে টানছে। গাড়ি ছাড়ল। লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে—'দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াও। চলতি ট্রেন থেকে যে নামবে সে-ই গুলি খাবে কিন্তু!'

বেঞ্চির উপর থেকে লাফ দিয়ে নামে সে। ছুটে যেতে চায় দরজার দিকে। সেই শুভ মুহূর্তেই ভোজপুরীর ঘুমন্ত আড়াইমনি বপুখানি উল্টে পড়ল পশ্চিমা মুসলমানটির ঠিক মাথার উপর। দুজনেই উল্টে পড়ল মেঝের উপর। এই সুযোগে একজন পুলিস টেনে দিয়েছে অ্যালার্ম চেনটা।

লিখতে যতক্ষণ লাগল তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি ঘটেছে ঘটনাটা। হুমড়ি খেয়ে পড়া মানুষদুটো যখন ফের উঠে দাঁড়াল তখন পশ্চিমা ভদ্রলোকের হাতে উঠেছে লোহার হ্যাণ্ডকাফ আর রিভলভারটা চলে এসেছে ভোজপুরীর দৃঢ় মুষ্টিতে। এত অতর্কিতে ব্যাপারটা ঘটে গেল যে সামান্য পুলিস অফিসার দু-জন তো ছার, স্বয়ং শার্লক হেবো পর্যন্ত তাজ্জব। ভোজপুরী তাঁর পুরুষ্টু গোঁফজোড়া খুলে ফেলতেই অফিসার দু-জন একসঙ্গে বলে ওঠেন—'স্যার! আপনি!'

ভোজপুরীবেশী আবগারি পুলিসের বড়সাহেব বললেন—হ্যাঁ, আমিই ; আসানসোল

থেকে ওকে ওয়াচ করতে করতে আসছি। আর তুমি মুখুজ্জে, তুমি এত বড়ইডিয়েট, বাঙালি ধরে ধরে শুধু নাম জিজ্ঞাসা করছ?'

মুখার্জি সাহেব মাথা চুলকে বলেন, 'না, স্যার, মানে, ইয়ে.... এ খোকা শুধু আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে.....

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় হেবো। তার কান অনেক আগেই বন্ধনমুক্ত হয়েছিল। বলে, 'খোকা নয়, বলুন শার্লক হেবো! আন্দাজে ঢিল ছোঁড়র অভ্যাস শার্লক হেবোর নেই। আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।'

ভোজপুরী-বেশী বড় সাহেব ওর পিঠে একটা হাত রেখে বলেন, —'বল তো ভাই, কি করে বুঝলে তুমি?'

—'বলছি।' হেবো উঠে দাঁড়ায় বেঞ্চির উপর। হাফপ্যান্টের দুই পকেটে দুটো হাত চালিয়ে দেয়। গোয়েন্দা-গল্পের শেষ দিকে এটি গোয়েন্দার অবশ্য কর্তব্য, সে বিষয়ে তার জ্ঞান আছে। কোন-কোন ক্লুর সাহায্যে সে অপরাধীকে চিনে ফেলছে এটা বুঝিয়ে দেওয়াও গোয়েন্দার কর্তব্যভুক্ত (ঠিক ঐ ভঙ্গিতে শার্লক হোমসের একটা ছবি দেখেছিল হেবো কোন বইতে—অবশ্য তাঁর গায়ে ছিল ওভারকোট, মাথায় চোঙা টুপি আর মুখে পাইপ—সেসব কিছুই হেবোর নেই)। হেবো গম্ভীরভাবে বলে, 'রেল কোম্পানির ঐ বিজ্ঞপ্তিটা হাওড়া স্টেশনেই নজরে পড়েছিল আমার— "চোর জুয়াচোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।" তখন থেকেই আমি সকলকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করি। তারপর দেখলাম, লেখা আছে— "নিকটেই আছে।" আমার প্রথম সন্দেহ হয়েছিল ঐ সাধুবাবার উপর। কিন্তু সে তো আমার নিকটেই নেই, সে আছে বেশ খানিকটা দূরে!

এবার হো-হো করে হেসে ওঠে সবাই। মুখার্জি-সাহেব বলেন, 'দেখলেন স্যার, খোকার কাণ্ড।'

কিন্তু আবগারি বিভাগের বড়-সাহেব তখনও শুনতে চান হেবোর যুক্তি। বলেন, 'তা যেন হল, কিন্তু তোমার নিকটে তো অনেকেই ছিল—ওকেই বা দেখালে কেন?'

'বলছি। আমি প্রথমেই লক্ষ্য করি, আসানসোলে মেজদা যখন ওকে বললে যে, বসবার জায়গা নেই, তখন ও মেজদাকে যে ভাষায় জবাব দিল তার বিন্দু-বিসর্গ বোঝেনি মেজদা। মেজদা যে কিছুই বোঝেনি তা বুঝতে পেরেছিলাম তার ফ্যাল ফ্যাল-করা চাহনি দেখে (এখন অবশ্য মেজদা যেভাবে তাকাচ্ছে তাকে অগ্নিদৃষ্টি বলা উচিত)। তখনও কিন্তু উনি সরলভাষায় কিছু বললেন না। বাঙলা দেশে পশ্চিমারা বাঙালীর সঙ্গে, বিশেষ করে মেজদার মত ছেলেমানুষের সঙ্গে (মেজদার চেহারাটা এখন ফোটো তুলে রেখে দেবার মতো) যে ভাষায় কথা বলে, সেটা সাধারণত হিন্দি-বাঙলার একটা খিচুড়ি ভাষা। "খোঁকি তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবিস" গোছের ভাষা। কিন্তু তা না বলে ইনি বললেন খাঁটি হিন্দি অথবা উর্দু। সিদ্ধান্ত—ইনি বাঙলা ভাষা একেবারেই জানেন না।

'তার একটু পরেই লক্ষ্য করে দেখি, পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের পরিত্যক্ত আসনে জুত করে বসতে পাওয়ার পরই উনি বাবার আনন্দবাজারখানা টেনে নিলেন। যেহেতু ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, উনি বাঙলা ভাষা জানেন না, ফলে অনুসিদ্ধান্ত : উনি খবরের কাগজের ছবি দেখছিলেন। বেশ কথা। কিন্তু শেষ রাত্রে গাড়ি যখন টানেলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তখন আমার ঘুম ভেঙে যায়। তখন হঠাৎ লক্ষ্য হয়, কামরায় দু-জন লোক জেগে আছেন। তার মধ্যে একজন ঐ ভদ্রলোক—তিনি তখনও খবরের কাগজ দেখছেন। আসানসোল থেকে গ্র্যাণ্ড-কর্ড লাইনে টানেল অন্তত তিন-চার ঘণ্টার পথ। এতক্ষণ ধরে কেউ খবরের কাগজে ছবি দেখে না। সিদ্ধান্ত : উনি আনন্দবাজারখানা পড়ছিলেন। তাহলে সবটা মিলিয়ে কী দাঁড়াল? ইনি বাঙলা ভাষা বেশ ভালই জানেন— অক্ষর পরিচয়ও আছে, কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। ইনি রাত জেগে আনন্দবাজার পড়তে পারেন, আর একটি বাঙালী বাচ্চার সঙ্গে বাঙলায় কথা বলতে পারেন না। সম্ভবত ইনি বাঙালী, অথচ পশ্চিমার বেশে রেল-ভ্রমণ করেন। এঁর সঙ্গে আছে একটি স্যুটকেস—বসবার ভাল জায়গা পাচ্ছেন না—তবু সেই স্যুটকেসটাকে বাঙ্কের উপর না তুলে দিয়ে পাশে নিয়ে বসে আছেন। এদিকে পুলিসের ক্লু—চোর বাঙালী, এক স্যুটকেস আফিং নিয়ে পালাচ্ছে। এরপর জানতে আর কি বাকি থাকে স্যার, আপনিই বলুন!'

মুখার্জি-সাহেবের মুখের হাসি ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে। তাঁর দিকে ফিরে ভোজপুরীবেশী বড়সাহেব ইংরাজিতে বললেন, 'আমার ইচ্ছে করছে এই ছেলেটির কাছে তোমাকে ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবিশ করে রেখে দিতে!'

মুখার্জি-সাহেব মাথাটা আর তুলতে পারেন না।

আর হেবোর দিকে ফিরে উনি বলেন, 'শার্লক হোম্‌স তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন—আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি তাঁর মতো সার্থক সত্যান্বেষী হও। তবে বড় হয়ে যখন কোনান ডয়েল পড়বে তখন জানতে পারবে শার্লক হোম্‌স শুধু বড় গোয়েন্দাই ছিলেন না; নানান বিষয়ে তাঁর ছিল প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। বড় ডিটেকটিভ হতে গেলে তোমাকেও প্রথম খুব ভাল করে লেখাপড়া শিখতে হবে। কাল রাত্রে তুমি যেমন সকলকে লক্ষ্য করেছ, তেমনি আমিও সকলকে লক্ষ্য করতে করতে এসেছি, যদিও সারা রাতই আমার নাক ডেকেছিল। তাই এর সুটকেসের ভিতর লুকানো আফিংটাকে যেমন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, তেমনি তোমার হাফপ্যাণ্টের ডান পকেটে লুকানো "হত্যাকারী কে?" বইটাকে দেখতে পেয়েছি আমি। যদি শার্লক হোমসের মত বড় গোয়েন্দা হবার সত্যই ইচ্ছা থাকে, তাহলে প্রথমেই ঐ সব বাজে গোয়েন্দা-গল্পের বই পড়ার অভ্যাস তোমাকে ছাড়তে হবে। যাই হোক, আজকের দিনে তোমার সাফল্যের চিহ্ন-স্বরূপ তোমাকে উপহার দিলাম আমার এই হাতঘড়ি।'

নিজের মণিবন্ধ থেকে খুলে নিয়ে দামী রিস্টওয়াচটা তিনি পরিয়ে দিলেন হেবোর হাতে। হেবো যদি আবগারি বিভাগের ঐ বড়-সাহেবের উপদেশ মেনে নিয়ে তার

গোয়েন্দাগিরির খেয়াল ত্যাগ করতে পারত, তাহলে আমার গল্পও শেষ হত এখানে। বলতে পারতাম, এরপর থেকে হেবো মন দিয়ে পড়াশুনো শুরু করল। বলতে পারতাম—হেবোর গোয়েন্দা-গল্প শুনতে হলে আরও বছর আট-দশ পরে তোমাদের আসতে হবে, ভাই।

কিন্তু হেবো মনে-প্রাণে ওঁর কথাটা গ্রহণ করতে পারেনি। পারবে কোথা থেকে? অত বড় সাফল্যে তার মাথাটা ঘুরে গেল। খবরের কাগজে সংবাদটা ছাপা হয়েছিল—**'বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে আফিংচোর ধৃত'** এই শিরোনামা দিয়ে। ছুটির পর রীতিমতো সাড়া পড়ে গেল ওর স্কুলে। বন্ধুরা সবাই ওকে নিয়ে কদিন খুব হৈ-চৈ করল। এমনকি হেডমাস্টারমশাই পর্যন্ত ওকে ডেকে নিয়ে ওর বুদ্ধির তারিফ করলেন। কিন্তু হেডমাস্টার মশাইয়েরও ঐ একই দোষ! শুধু প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হলেন না তিনি, বললেন —'বড় গোয়েন্দা হতে গেলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান বিষয়ে অধিকার থাকা চাই'। বাড়িতেও খাতির বেড়ে গেল হেবোর। মেজদা আর সাহস করে কোন কথাই বলে না। গর্বে হেবোর মাটিতে পা পড়ে না। ডিটেকটিভ বইয়ের প্রতি একটা অদ্‌ভুত নেশায় পেয়ে বসল তাকে। রাজ্যের গোয়ন্দা-গল্পের বই যোগাড় করে শুধু পড়তে থাকে রাত জেগে। সেবার পরীক্ষায় আরও খারাপ ফল হল তার। বাবা বকলেন, কাকাও দুঃখ প্রকাশ করলেন; কিন্তু হেবোর মনে কোনও দুঃখ নেই, বলে—'পাশ তো করেছি!'

ক্লাশ-প্রমোশন নিয়ে হেবো এবার নাইনে উঠেছে। ওর কাকা বারবার বললেন—'হেবো, এই দুটো বছর একটু মন দিয়ে পড়াশুনো কর। সায়েন্স নিয়েছিস, হায়ার সেকেণ্ডারিতে ফার্স্ট ডিভিশন না পেলে কোন ভাল কলেজে সীট পাবি না।'

হেডমাস্টারমশাইও তাকে কাছে ডেকে নিয়ে অনেক ভাল ভাল উপদেশ দিলেন, বললেন—'তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলে থাকতে এ বছর আমার স্কুল থেকে যদি কেউ স্কলারশিপ না পায়, তাহলে সে দুঃখ আমার চিরকাল থাকবে।'

হেবো মনে মনে বললে, 'স্কলারশিপ আর কটা টাকা? তার চেয়ে একটা বড় চুরির কিনারা করতে পারলে অনেক বেশি টাকা পুরস্কার পাওয়া যায়।'

হেডমাস্টারমশাই বলেন, 'আমাকে কথা দাও, স্কুল থেকে পাশ করে যাবার আগে আর গোয়েন্দাগিরি করবে না তুমি।'

হেবো বাধ্য হয়ে বলে, 'আচ্ছা বেশ।'

এই সময় হেবো ডাকে একখানা চিঠি পেল। হাতের লেখা অপরিচিত কিন্তু চিঠি পড়ে অনায়াসেই বুঝতে পারে কে লিখেছেন তাকে। চিঠিখানায় লেখা ছিল—

কল্যাণীয়েষু,

তুমি আমায় ভুলে গেছ কি না জানি না। আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিনি! তোমার মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু আমার সহকর্মী। তাঁর কাছেই তোমাদের সব খবর পাই। তাঁর কাছেই শুনলাম, এ বছর ক্লাস-পরীক্ষায় তুমি খুব সুবিধা করতে পারনি।

প্রমোশন পেয়েছ বটে, কিন্তু সংস্কৃতে নাকি তোমার পাশ-নম্বর ছিল না। মনে হয় আমার কথা তুমি কানে তোলনি। মন দিয়ে পড়াশুনা করলে এত খারাপ ফল কখনও হতে পারে না। আমি তোমার উপর অনেক ভরসা করেছিলাম। তুমি আমাকে নিরাশ করেছ। এখন আবার বলছি, ঐ সব বাজে ডিটেকটিভ বই পড়া ছেড়ে পড়শুনায় মন দাও। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ভালভাবে জানা না থাকলে কখনও বড় সত্যান্বেষী হওয়া যায় না। জান তো, —স্বামী বিবেকান্দ বলেছিলেন, চালাকির দ্বারা কখনও কোনও মহৎ কাজ হয় না। আশা করি এবার পরীক্ষার ফলাফল দেখে তোমার চৈতন্য হবে।

আমাকে চিনতে পারলে তো? নেহাত না পারলে, তোমার বাঁ হাতের কব্জির কথা কান পেতে শোন। আমার ঠিক-ঠিক পরিচয় সে টিক-টিক করে বলে দেবে।

আশীর্বাদক

ইতি—

এই চিঠিখানা পেয়েও কিন্তু হেবোর কোন ভাবান্তর হল না। সে তখন মেতে আছে তাদের স্কুলের থিয়েটার নিয়ে! পুরস্কার বিতরণী সভায় শহরের বিশিষ্ট অতিথিরা দল বেঁধে আসেন। ছেলেদের গার্জেনরাও নিমন্ত্রিত হন। প্রতি বছরই এই দিনে একটা বড় রকমের হৈ-চৈ হয়। এবার স্থির হয়েছে, ছেলেরা অভিনয় করবে রবীন্দ্রনাথের নাটক—*মুকুট*। হেবো ভাল অভিনয় করে, সব গুণই আছে তার। ছেলেরা কেউ-কেউ বলে, ওকে মেজকুমার ইন্দ্রকুমারের পার্টেই মানাবে। ঐটেই সবচেয়ে ভাল পার্ট। কিন্তু হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'না, হেবো করবে রাজধরের পার্ট—ঐটেতেই ওকে ঠিক মানাবে।'

কথাটা হেবোর ভাল লাগেনি। এ যেন তাকে অপমান করতেই বলা। রাজধর হচ্ছে কুচক্রী, বদমায়েশ। কিন্তু থিয়েটার করার নিয়ম হচ্ছে —কোন্ পার্ট পেয়েছ তা নিয়ে কোন খুঁতখুঁতানি না রেখে যেটা পেয়েছ সেটাই ঠিকমত রূপায়িত করা। এটাই হচ্ছে নাটক অভিনয়ের মূল কথা। সবাই যদি নায়ক হতে চায়, তাহলে নাটক হয় না— হয় একটা মন-কষাকষির পণ্ডশ্রম। তাই হেবোও মনে কোন খেদ না রেখে ছোট রাজকুমার রাজধরের পার্টটা মুখস্থ করে নিল।

গোল বাধল রতনাটাকে নিয়ে। রতন হেবোদের চেয়ে এক ক্লাস নিচুতে পড়ে। খুব বড়লোকের ছেলে। ওর বাবা নাকি কোথাকার কোন স্টেটের রাজা ছিলেন। এখন অবশ্য রাজ্য নেই—ভারতবর্ষের সব স্টেটের রাজ্যই এখন ভারত সরকার নিয়েছেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কীর্তি এটা, হেবো জানে। তা হোক, তবু রতনরা খুব বড়লোক। ওর বাবা যে এককালে রাজা ছিলেন এটা কিছুতেই ভুলতে পারে না রতন। ক্লাসের ছেলেরা তাকে সমীহ করে চলে। কালো রঙের একটা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ি ওকে প্রত্যহ স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যায়—আবার ঠিক চারটের সময় ওকে নিতে আসে।

রতনকে দেওয়া হয়েছিল ছোট রাজকুমার রাজধরের বন্ধু ধুরন্ধরের চরিত্র। অর্থাৎ হেবোর সঙ্গেই তাকে অভিনয় করতে হবে। রতন বলে—'দেখিস না কি কাণ্ড করি আমি! তোরা তো সব টিনের তরোয়াল ঘোরাবি। আমি নিয়ে আসব সত্যিকারের তরোয়াল! সোনার কাজ করা বাঁটি—ঈ—য়া বড়! আমার বাবার তরোয়াল!'

সবাই অবাক হয়ে শোনে।

হেবো বন্ধুদের বলে, 'যতসব চালবাজি! সত্যিকারের তরোয়াল কখনও থাকতে পারে নাকি ওর বাবার? সে-সব সর্দারজি কবেই কেড়ে কুড়ে নিয়েছেন।'

রতন বলে, 'আচ্ছা দেখা যাবে!'

ক্রমে এগিয়ে আসে নির্দিষ্ট দিন। ড্রেস-রিহার্সালের দিনে সবাই জমায়েত হয়েছে স্কুল ছুটির পর। কাল থিয়েটার, আজ তাই সেজে-গুজে সবাই মহড়া দেবে। স্কুলের বড় হলঘরটায়। স্টেজ বাঁধার কাজ শেষ হয়েছে। কয়েকটি ছেলে লাল-নীল কাগজের শেকল বানিয়ে ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে টাঙিয়ে দিচ্ছে। যারা অভিনয় করবে তাদের সাজ-পোশাক পরানোর কাজ হয়ে গেছে। বাঙলার স্যার যখন রতনের কোমরে ভাড়া-করে-আনা টিনের তরোয়ালটা বেঁধে দিতে গেলেন তখন রতন বলে ওঠে, 'আমাকে স্যার ওসব টিন-ফিনের তরোয়াল দিতে হবে না। আমার সত্যিকারের তরোয়াল চাই।'

বাঙলা স্যার অবাক হয়ে বলেন, 'সে আবার কি রে রত্না! সত্যিকারের তরোয়াল আমি কোথায় পাব?'

ঠিক সেই সময়েই স্কুলের গেটে এসে থামল কালো রঙের প্রকাণ্ড গাড়িটা। উর্দিপরা একজন চাপরাশি 'হলে' ঢুকে মাস্টারমশাইকে আভূমি নত হয়ে এক মোঘলাই কুর্ণিশ ঝাড়ে। তার হাতে একটা প্রকাণ্ড তরোয়াল। রতন হাত বাড়িয়ে তরোয়ালটা নেয়। সকলেই ছুটে আসে জিনিসটা দেখতে। সত্যিই দেখবার মত জিনিস বটে! বাঙলা স্যার খাপ থেকে সেটাকে বার করতেই সকলের চোখ ঝলসে গেল। ঈয়া লম্বা ঝকঝকে একটা ইস্পাতের তরোয়াল। মুঠটায় সোনালি কাজ করা। খাপটার গায়েও নানান কারুকার্য। রমেশবাবু ইতিহাস পড়ান, সেটা নেড়ে-চেড়ে বললেন—'এ যে দেখছি ভিক্টোরিয়া যুগের সোর্ড! এ তো ত্রিপুরার সৈন্যদলে বেমানান হবে!'

মুখ শুকিয়ে যায় রতনের। হেডমাস্টারমশাই বলেন, 'আহা তা হোক। অত খুঁটিয়ে আর কে দেখতে যাচ্ছে! বেচারি অত শখ করে এনেছে! দিন রমেশবাবু, ওটা ওর কোমরে বেঁধে।'

রমেশবাবু অগত্যা সেটা রতনের কোমরের বেল্ট থেকে ঝুলিয়ে দিলেন। বাঙলা-মাস্টারমশাই তবু বলেন, 'কিন্তু আরও একটা কথা। রাজপুত্রদের তরোয়ালের চেয়ে এটা অনেক লম্বা আর অনেক দর্শনধারী। ধুরন্ধর সামান্য সৈনিক, —এটা খুব খারাপ দেখাবে না কি?'

হেবো তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'হ্যাঁ স্যার, তার চেয়ে ওটা সুবলদার কোমরে বেঁধে দিন।

সুবলদা ইন্দ্রকুমারের পার্ট করেছ—ও-ই আসলে গল্পের হিরো। তা ছাড়া সুবলদা অনেক লম্বা। ঠিক ফিট করে যাবে।'

সুবল ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। তালগাছের মত মাথায় বেড়েছে খালি। লোলুপ দৃষ্টিতে বেচারি তাকিয়ে দেখছিল তরোয়ালটার দিকে।

রতন প্রতিবাদ করে, 'ঈস! এ আমার বাবার জিনিস! আমি আর কাউকে দেব কেন?'

হেডমাস্টারমশাই বলেন, 'কিন্তু ওটা যে মাপে তোমার পক্ষে অনেক বড় হচ্ছে রতন।'

'হোক। আমার বাবার তরোয়াল আমি কাউকে দেব না।'

সকলেই লজ্জা পেল ওর বেহায়াপনায়। হেবো মর্মান্তিক চটে গেল। কিন্তু মাস্টারমশাইরা সকলেই রয়েছেন। তাঁরা আর কিছু বললেন না। অগত্যা ওটা রতনের কোমরেই বাঁধা থাকল।

মহড়া শেষ হয়ে গেলে বন্ধুদের মধ্যে আবার ঐ নিয়ে গুজ-গুজ ফুস-ফুস শুরু হয়ে গেল।

ক্লাস টেনের নবীনদা বলে, 'রৎনাটা সেলফিশ নাম্বার ওয়ান। ওর উচিত ছিল ওটা সুবলকে দেওয়া।'

গোবরা বলে, 'বিশেষত যখন হেড-স্যার পর্যন্ত বললেন—'

ট্যানা বলে, 'রৎনাটাকে জব্দ করা যায় না?'

'কি করে?'

'ধর, কাল যদি ওর তরোয়ালখানা হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়?'

'সে অসম্ভব। ও তো তরোয়ালখানা সারাক্ষণ কোমরে বেঁধে ঘুরে বেড়াবে। তাছাড়া তরোয়াল চুরি গেলেই হেড-স্যার শার্লক হেবোকে তলব করবেন, চোর খুঁজে দিতে। আর তৎক্ষণাৎ আমারা সদলবলে ধরা পড়ে যাব।'

হো-হো করে হাসল হেবো।

ট্যানা বলে, 'তার চেয়ে চল, সবাই মিলে ড্রইং মাস্টারমশাইয়ের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বলি। তিনি কি বুদ্ধি দেন শোনা যাক।'

'তাই চল তাহলে।'

সদলবলে ওরা এসে হাজির হল ড্রইং ক্লাসে। স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ : কিন্তু ড্রইং মাস্টারমশাই বাড়ি যান নি। তিনি একগাদা পীসবোর্ড কেটে, শলমা-চুমকি-রাঙতা মুড়ে একটা সুন্দর মুকুট বানাচ্ছিলেন। ত্রিপুরা রাজার রাজমুকুট—কাল থিয়েটারে লাগবে। ওরা অনেকক্ষণ ধরে মুকুট বানানো দেখল। কী সুন্দর কারুকার্য করেছেন তাতে ড্রইং স্যার!

শেষ পর্যন্ত ওরা সব কথা খুলে বলল ড্রইং স্যারকে। ধৈর্য ধরে তিনি সবটা শুনলেন এবং শেষ পর্যন্ত বললেন, 'তোমরা ঠিকই বলেছ, রতনের পক্ষে এটা অন্যায়ই হয়েছে। টীম-ওয়ার্কের কথা না মনে রাখলে কখনও ভালো থিয়েটার করা যায় না!'

ট্যানা বলে, 'তাছাড়া হেড-স্যারও ওকে বললেন তরোয়ালটা সুবলকে দিতে।'

ড্রইং স্যার বলেন, 'ঠিকই তো। তাঁর কথা অমান্য করা খুবই অন্যায় হয়েছে।'

হেবো আর সহ্য করতে পারে না। বলে ওঠে, 'অন্যায় যে হয়েছে, সে তো আমরা সবাই মেনে নিয়েছি স্যার। এখন অন্যায়ের প্রতিকার কী করা যায় বলুন।'

ড্রইং স্যার অনেকক্ষণ চোখ বুজে কি-যেন চিন্তা করলেন। তারপর বলেন, 'দেখ, একটা কথা আছে। যে সয়, সে রয়।'

ব্যাস, এক কথায় মামলা ডিসমিস্।

হেবো কিন্তু ছোড়নেওয়ালা নয়। সে বলে, 'ও ছাড়া আরও একটা কথা আছে স্যার '—*অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ-সম দহে।*'

ড্রইং স্যার অনেকক্ষণ চুপ করে কি-যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, ঐরকম একটা কথাও আছে বটে। যাক, এখন তোমরা যাও। আমি মুকুটটা শেষ করি।'

ড্রইং মাস্টারমশাই ঐ রকম আপন-ভোলা মানুষ।

বন্ধুরা হেবোকেই মুরব্বি পাকড়াও করে। বলে, 'তুই একা যা হয় বিহিত কর।'

হেবো বলে,—'দেখি ভেবে!'

পরদিন প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশান। সন্ধ্যা ছয়টা তিন মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হবে। ছয়টা

তিন মিনিট কেন? তার একটা ইতিহাস আছে। আজ এগার বছর ধরে এই ছয়টা তিন মিনিটেই অনুষ্ঠান হচ্ছে। এই হেডমাস্টারমশাই আসার পর থেকে। তিনিই এ নিয়মটা চালু করেছেন। আগে এমন বহুবার হয়েছে যে, ছাত্ররা সেজে-গুজে তৈরি হয়ে আছে, অথচ প্রেক্ষাগৃহে যথেষ্ট জনসমাগম হয়নি বলে অভিনয় শুরু করা যাচ্ছে না। নিমন্ত্রণ-পত্রে 'ছয়টা' লেখা থাকলে সকলেই ধরে নিতেন—বাঙালীর টাইম, ঐ সাড়ে ছ-টা নাগাদ শুরু হবে আর কি। আবার কোন-কোন বছর ছেলেরাও ঠিক সময়ে তৈরি হত না—ভাবতো ঠিক সময়ে তৈরি হয়ে আর কী লাভ? দর্শকরা তো সেই সাড়ে ছ-টার আগে আর আসছেন না!

ছাত্র আর দর্শকদের সময়ানুবর্তিতার মূল্যটা বুঝিয়ে দিতে হেডমাস্টারমশাই একটা ফন্দি বার করলেন। পরের বৎসর নিমন্ত্রণ-পত্রে ছাপা হল—অনুষ্ঠান শুরু হবে ইণ্ডিয়ান স্টান্ডার্ড টাইম সন্ধ্যা ছয়টা বেজে তিন মিনিটে।'

যাঁরা নিমন্ত্রণ-পত্র পেলেন তাঁরা একটু অবাক হলেন। ব্যাপার কি? ছটা নয়, সওয়া-ছটা বা সাড়ে-ছটা নয়—একেবারে ছটা বেজে তিন মিনিটে প্লে শুরু হবে মানে? কেউ কেউ প্রশ্নও করলেন হেডমাস্টারমশাইকে—'এ আবার কি মশাই? ছটা বেজে তিন মিনিটে প্লে শুরু হবে মানে?'

হেডমাস্টারমশাই গম্ভীর হয়ে উত্তরে বলেছিলেন, 'ছটা বেজে তিন মিনিট মানে সাতটা বাজতে সাতান্ন মিনিট।'

সে বছর কৌতূহলের আতিশয্যে দর্শকেরা দেখতে এলেন ব্যাপারটা। ব্যাপার কিছুই নয়, হেডমাস্টারমশাই ছয়টা বাজতে দুই মিনিটে প্রথম ঘণ্টা বাজবার ব্যবস্থা করলেন, এবং পর্দা উঠে গেল ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডর্ড টাইমের ঠিক ছয়টা বেজে তিন মিনিটে।

সেই থেকে আজ এগারো বছর ধরে এ স্কুলের ট্র্যাডিশান সন্ধ্যা ছয়টা বেজে তিন মিনিটে অভিনয় শুরু করা। সেই বছর থেকে দর্শকেরা জেনে গেছেন, ছয়টা বেজে পাঁচ মিনিট পরে হলে ঢুকলে দুই মিনিটকালের অভিনয় দেখা থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন।

পাঙচুয়ালিটি রক্ষা করার এ ব্যবস্থাটা বেশ মজার, নয়? তোমরাও এটা চালু করার কথা ভাবতে পার।

যাক, যা বলছিলাম। যারা অভিনয় করবে তারা চারটের মধ্যে সবাই হাজিরা দিয়েছে। ড্রইং স্যার আর রমেশবাবু একের পর এক মেক-আপ দিয়ে যাচ্ছেন। সাদা সাদা চুল দাড়িতে ক্লাস ইলেভেনের হারানদাকে আর চেনাই যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে ত্রিপুরাবাহিনীর বৃদ্ধ সেনাপতি স্বয়ং ঈশা খাঁ। যুবরাজের সাজ পোশাকও পরা হয়ে গেছে। তারিণীদা সেজেছে ত্রিপুরাধিপতি। ঝলমলে সাজ পোশাকে মুকুট মাথায় ঘুর ঘুর করছে। এবার সুবলদা বসেছে ইন্দ্রকুমারের মেক-আপ নিতে। রতন সকলের আগে ধুরন্ধরের মেক-আপ নিয়ে বিরাট তরোয়ালটা কোমরে বেঁধে স্টেজের উপর পায়চারি করে পার্ট মুখস্থ করছে। অতিকায় তরোয়ালটা ঠক্ ঠক্ করে মাটিতে ঠোকা খেয়ে তাল দিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। নিচু ক্লাসের

ছেলেগুলো বারে বারে উঁকি দিচ্ছে গ্রীনরুমের ভিতর, আর উঁচু-ক্লাসের ছেলেদের ধমক খেয়ে বারে বারে ছুটে পালাচ্ছে।

যারা ভলান্টিয়ার হয়েছে, তাদের জামায় একটা করে রিবন-বাঁধা ব্যাজ। বুক, তথা ব্যাজ ফুলিয়ে তারা ঘন ঘন আসছে প্রেক্ষাগৃহ থেকে গ্রীনরুমে! খবর দিয়ে যাচ্ছে 'হলে' কত লোক হয়েছে, কে কে এসেছেন। হেডমাস্টারমশাই একবার হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে গেলেন, 'ফারদার এইটিন মিনিটস বয়েজ! ছটা বাজতে কুড়ি হয়েছে, ঠিক ছটা বাজতে দু'মিনিটে ওয়ার্নিং বেল পড়বে। তার মধ্যে একেবারে রেডি হওয়া চাই। ছটা তিনে পর্দা উঠবে, মনে থাকে যেন, আর য়ু অল রেডি?'

এরা বলে, 'নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা রেডি।'

বস্তুত তখনই সবাই তৈরি। সেই মুহূর্তেই পর্দা ওঠালে ওরা অভিনয় শুরু করতে পারে। ফলে মিনিট কুড়ি আগেই ওরা তৈরি হয়ে গেছে। স্বস্তির নিশ্বাস পড়লে রমেশবাবুর।

হঠাৎ তারিণী এসে বলে, 'স্যার, আমার মুকুট?'

'মুকুট? সে তো তোমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলাম।'

'আমার মাথায় কিছু নেই স্যার!'

রমেশবাবু তখন একজন প্রতিহারীর পাগড়িটা খুলে নতুন করে বাঁধছিলেন, হেসে বললেন, 'সে তো পরীক্ষার খাতা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু মাথার উপর থেকে মুকুট হারিয়ে যায়, কেমনতর মহারাজা তুমি?'

কিন্তু ব্যাপারটা যে রসিকতার নয়, তা বোঝা গেল অল্প পরেই! মুকুট কোথাও পাওয়া গেল না। সর্বনাশ! খোঁজ খোঁজ খোঁজ! স্টেজের উপর নেই, গ্রীনরুমে নেই, আশেপাশে কোথাও পড়ে নেই। অত বড় রাজমুকুটটা এতগুলো লোকের চোখের উপর দিয়ে কর্পূরের মত উপে তো যেতে পারে না? তাহলে? সবাই মিলে তারিণীকে গালাগালি করতে থাকে। এত বড় আহাম্মক, যে মাথার উপর থেকে মুকুট হারিয়ে যায়, টের পায় না? খবর পেয়ে হেড-স্যার ছুটে এলেন। তাঁর মাথা-ভরা টাক, নাহলে হয়ত পট-পট করে মাথার চুলই ছিঁড়তেন তিনি। বলেন, 'শেম, শেম, বয়েজ! এতবড় দায়িত্বজ্ঞানহীন তোমরা! আর এগারো মিনিট মাত্র বাকি আছে, এখন মুকুট নাটকে মুকুটই নেই? যেমন করে পার খুঁজে বার কর! ঠিক ছটা তিন মিনিটে আমি পর্দা তুলব। যদি এর ভেতর খুঁজে না পাও—তাহলে আমি নিজে স্টেজে গিয়ে অ্যানাউন্স করব যে, আমার ছেলেদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য অভিনয় শুরু হতে দেরি হবে।'

কী কেলেঙ্কারি!

এইসময়ে কে এসে বলল, 'গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট এসেছেন স্যার।'

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন হেডমাস্টারমশাই।

সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। সবাই মিলে দ্বিগুণ উৎসাহ খুঁজতে থাকে। রমেশবাবু এসে

জেরা শুরু করেন 'তারিণী, তোমার একেবারে কিছু মনে পড়ছে না? লক্ষ্মী বাবা, একটু ভেবে দেখবার চেষ্টা কর।'

তারিণী আমতা আমতা করে। কী জবাব দেবে ভেবে পায় না।

এবার মহড়া নিতে এগিয়ে আসেন স্বয়ং হেডপণ্ডিতমশাই তাঁর বিশাল বপুখানি নিয়ে। স্বনামধন্য হেডপণ্ডিতমশায়ের নামে সারা স্কুল থরহরি কাঁপে। রমেশবাবুকে সরিয়ে দিয়ে বলেন, 'ও আপনার কর্ম নয় মশাই! অমন বাপু-বাছা করলে মুকুটের সন্ধান পেতে রাত্রি প্রভাত হয়ে যাবে। লাঠ্যৌষধিই এক্ষেত্রে একমাত্র প্রযোজ্য, তদ্‌ভিন্ন এর সমাধান অসম্ভব! ছিদেম, তোর ষষ্ঠিটা দে দিকিন।'

শ্রীদাম প্রতিহারীর পার্ট করবে। ভয়ে ভয়ে ত্রিপুরাবাহিনীর প্রতিহারী তার তেলপাকা লাঠিখানা এগিয়ে দেয় হেডপণ্ডিতের দিকে। পণ্ডিতমশাই সেটা বাগিয়ে ধরে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে হাঁক পাড়েন, 'তেরো! ইদিকে আয়!'

নবমীর বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে তারিণী এগিয়ে আসে।

'বল অকালকুষ্মাণ্ড, অনড়ান! মাথা থেকে মুকুট খুলেছিলি একবারও? অনৃতভাষণ করলে এক ডাণ্ডায় তোর রাজাগিরি ঠাণ্ডা করে দেব!'

ত্রিপুরাধিপতি কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'পরচুলে ছারপোকা ছিল স্যার, তাই একবার মাত্র মাথা থেকে মুকুটটা খুলেছিলুম!'

'বর্ত্তে এস বাছাধন! মুকুট তাহলে খুলেছিলি? তখন কার হাতে দিয়েছিলি? সত্য কথা বলবি বলীবর্দ!'

'রতনকে সেটা ধরতে দিয়েছিলুম, স্যার!'

'হুম! রৎনা! ইদিকে আয়!'

তরোয়াল খট খট করতে করতে এবার এগিয়ে আসে রতন। ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেলার আগের মুহূর্ত যেন!

'আরে আরে, তোর কটিবন্ধে উটি কী? ও তো টিনের তরবারি নয়? দেখি, দেখি ওটা বার করে দে তো!'

কাঁপতে কাঁপতে রতন তরোয়ালখানা বার করে দেয়।

অস্ত্রটা হাতে পেয়ে এবার যেন মহিষাসুর হাসলেন।

'বাঃ! খাসা জিনিস!'

লাঠিখানা ছিদামকে ফেরত দিয়ে তরোয়ালখানা বাগিয়ে ধরেন এবার। ঠিক যেন মহিষাসুর। চোখদুটো আগুনের ভাঁটার মত ঘুরছে। তফাত এই যে মহিষাসুরের টিকি নেই, পণ্ডিতমশায়ের বিজয়কেতন ফ্যানের হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে। কোথাও কিছু নেই, হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন তিনি—'বল ছুছুন্দর! তারিণীর হাত থেকে মুকুট নিয়ে কোথায় রেখেছিলি?'

কাঁদো কাঁদো হয়ে রতন বলে, 'আমি জানি না স্যার, আমি নিশ্চিত তারিণীদাকেই ফেরত দিয়েছিলাম বোধহয়!'

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন পণ্ডিতমশাই, 'ওরে আমার তর্কচঞ্চু! একই নিশ্বাসে "নিশ্চিত" আর "বোধ হয়"! ঠিক করে বল অলম্বুষ! ফেরত দিয়েছিলি, না নিজের মাথায় পরেছিলি?"

'একবার পরেই ফেরত দিয়েছিলাম, স্যার!"

'বটে! এস বাছাধন! কেন পরেছিলি? তুই বেটা ধুরন্ধর সৈনিক, তুই কোন্ সাহসে ত্রিপুরাধিপতির রাজমুকুট মাথায় পরলি, তাই আগে বল! না হলে ঐ ফুটন্ত জল দেখছিস?

গ্রীনরুমের ওপাশে হাঁড়িতে চায়ের জল চড়ানো আছে। সেইদিকে নাটকীয়ভাবে পণ্ডিতমশাই তরোয়ালটা নির্দেশ করেন। রতন তাকিয়ে দেখে সেদিকে।

'ব্যাকরণ পড়িস? বল বলীবর্দ! 'নিপাতনে সিদ্ধ' মানে কী?'

রৎনা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

'মুকুট খুঁজে না পেলে আজ তোকে ঐ ফুটন্ত জলে 'নিপাতনে সিদ্ধ' কাকে বলে তাই শেখাব!'

ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে রংনা।

হেডমাস্টারমশাই ঠিক তখনই ফিরে আসেন। ঠিক ছটা বাজে। কেমন যেন শুকিয়ে গেছেন তিনি এই কয় মিনিটেই। বলেন, 'বয়েজ! এই এগারো বছরের ট্র্যাডিশান আজ নষ্ট হবে? পাঙচুয়ালি শুরু করতে পারব না আমরা?

রমেশবাবু বলেন, 'না না, আমরা ঠিক সময়েই শুরু করব। পরিমল একটা উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইবে—তার মধ্যেই ওটা আমরা খুঁজে বার করছি।'

ঠিক ছ-টা বেজে তিন মিনিটে যথারীতি পর্দা উঠে গেল। কথা ছিল পরিমল গাইবে—'সবারে করি আহ্বান' কিন্তু সে নার্ভাস হয়ে শুরু করল —'তোমার এই মহাবিশ্বে কিছু হারায় নাকো প্রভু।'

গান শেষ হয়ে এল, তখনও হারানো মুকুটের পাত্তা নেই। পরিমল উইংসএর দিকে এক নজর দেখে নিয়ে অন্তরাটা ফিরেফিত্তি শুরু করে। হেডমাস্টারমশাই হঠাৎ হেবোর দিকে ফিরে বলেন, 'একি হেবো! তুমি এমন চুপচাপ বসে আছ যে? খুঁজছ না? তোমরা থাকতে এমন একটা কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে অথচ তোমরা হাত পা ছেড়ে বসে আছ?'

হেবো মুখটা কাঁচুমাচু করে বলে, 'আপনি যে আমাকে গোয়েন্দাগিরি করতে বারণ করেছেন স্যার! না হলে এমন সহজ কেসটা তো কখন সলভ করে ফেলতাম!'

চমকে ওঠে সবাই। রমেশবাবু বলেন, 'তার মানে? তুমি বলে দিতে পার মুকুট কে নিয়েছে?'

অম্লানবদনে হেবো বললে—'তা পারি বই কি. স্যার।'

'কী আশ্চর্য! তবে অমন চুপ করে আছ কেন?'

'হেডমাস্টারমশাই যে আমাকে গোয়েন্দাগিরি করতে বারণ করেছেন।'

'কে? কে অপহরণ করেছে মুকুট?' চোখ লাল করে প্রশ্ন করেন হেডপণ্ডিতমশাই। হেডমাস্টারমশাই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'তার চেয়ে বড় কথা, মুকুটটা বর্তমানে কোথায় আছে তা জান?'

'তাও জানি স্যার!'

'কোথায়? কোথায়? হুমড়ি খেয়ে পড়ে সবাই।

গোবেচারির মত মুখ করে হেবো হেডমাস্টারমশাইকে বলে, 'বলব, স্যার?'

'বল, বল, আমাকে আর দগ্ধে মের না!'

'বলছি, স্যার। কিন্তু হারানো জিনিস খুঁজে দিলে আমাকে কী পুরস্কার দেওয়া হবে?'

সবাই চমকে উঠে। রমেশবাবু আত্মসম্বরন করে শুধু বলেন—'পুরস্কার! তুমি কী বলছ হেবো! এই কি দর-দাম করবার সময়?'

হেবো একগুঁয়ের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হেডপণ্ডিতমশাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে হেডমাস্টারমশাই নিজেই বলেন—'বেশ, বল বিনিময়ে কী পুরস্কার

চাও তুমি?'

অম্লানবদনে হেবো বললে—'আরে কিছু নয়, রতন তার তরোয়ালটা সুবলদাকে দিক।'

বলা বাহুল্য রতন তাতে এক কথায় রাজি।

এক লহমায় হেবো গ্রীনরুমের এক অন্ধকূপের ভিতর থেকে উদ্ধার করে আনল ত্রিপুরাধিপতির অপহৃত রাজমুকুট।

হেডপণ্ডিতমশাই বলেন—'এবার বল হেবো, কোন অনড্যান . . .

'না, এখন নয় পণ্ডিতমশাই! ওটা আমি দেখব। —হেবো, অভিনয় শেষ হলে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

'করব, স্যার।'

পরিমলের গান শেষ হতেই শুরু হয়ে গেল অভিনয়।

সবাই চলে গেলে হেবোর ডাক পড়ল হেডমাস্টারমশায়ের ঘরে।

সেখানে দু-জনের মধ্যে কী কথা হয়েছিল আমি জানি না। তবে খবর নিয়ে জেনেছি, হেডমাস্টারমশাই মুকুট চুরির অপরাধে স্কুলের কোন ছেলেকে কোন শাস্তি দেননি।

শাস্তি পেয়েছিল নিরপরাধ হেবো। সেই ডাক-পিয়ন মারফৎ প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশানের দিন-সাতের পর সে আবার পেল একখানা চিঠি :

'ছিঃ হেবো! শেষে আজকাল নিজেই চুরি করে নিজে গোয়েন্দাগিরি করছ!'

পলাশপুর পর্ব

বছর ঘুরে এল। এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে অবিনাশবাবু কোথাও যেতে পারবেন না। ছুটির মধ্যেও তাঁকে দু-একদিন নাকি কলেজে যেতে হবে। মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেল হেবোর। গত বছর এমন একটা ছুটিতেই কাশী যাওয়ার পথে সে অত বড় কাণ্ডটা করে। পথে বার না হলে কি আর চোর-ডাকাতের সন্ধান পাওয়া যায়? অত বড় সুযোগটা বোধহয় এবার নষ্ট হয়।

হঠাৎ হেবোর মা একদিন বললেন—'তোদের তো ছুটিই আছে, আমাকে একবার পলাশপুরে নিয়ে চল না। অনেক দিন জ্যাঠামশাইকে দেখিনি—শুনছি তাঁর খুব অসুখ। পারবি নিয়ে যেতে?'

হেবো তো একপায়ে খাড়া। মায়ের জ্যাঠামশাই অর্থাৎ দাদুকে খুব ছেলেবেলায় একবার দেখেছিল ওরা। পলাশপুরের সবচেয়ে নামকরা ডাক্তার তিনি। অনেক গল্প শোনা আছে দাদুর নামে। এবার স্বচক্ষে দেখা যাবে। বাদ সাধল মেজদা, বললে—'দেখ মা, নিয়ে আমি তোমাকে যেতে পারি, কিন্তু হেবোকে সামলানো আমার কর্ম নয়! কখন ওর মাথায় পোকা নড়বে আর ও গোয়েন্দাগিরি শুরু করবে! সুতরাং হয় হেবো এখানে থাকুক, আমি তোমাকে নিয়ে যাই, অথবা তুমি আমার সঙ্গে চলো, হেবো এখানে গোয়েন্দাগিরি করুক।

মা হেসে বললেন—'না, হেবোকে আমিই সামলাবো। তোকে ভাবতে হবে না।'

অগত্যা হেবো, তার মা আর মেজদা একদিন এসে হাজির হলেন পলাশপুরে। রায়সাহের নিবারণ মৌলিক পলাশপুর শহরেই শুধু নয় সারা অঞ্চলটার মধ্যে সবচেয়ে পশারওয়ালা ডাক্তার। বয়স ষাটের কোঠায়, সত্তর ছুঁই-ছুঁই। তবু এখনো অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারেন। মস্ত বাড়ি, গাড়ি, বাজারের উপর ডিসপেন্সারি। রায়সাহেব নিজে নিঃসন্তান। তাঁর দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে ছাড়া অত বড় বাড়িটায় আর যারা থাকে তারা চাকর ড্রাইভার অথবা দরোয়ান শ্রেণীর। রায়সাহেবের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এই ভাগ্নেটির দুর্ব্যবহারে নাকি আত্মীয়-স্বজনেরা সবাই একে-একে তাঁকে ত্যাগ করেছে। হেবোর মাও এজন্য আসতেন না তাঁর জ্যাঠার কাছে, তবে আজ নাকি তিনি মরণাপন্ন অসুস্থ, তাই এসেছেন।

দাদুর বাড়িতে পৌঁছেই হেবোর মনে হল, আবহাওয়াটা কেমন যেন ভারি-ভারি। দাদু কারও সঙ্গে ভাল করে কথাই বলেন না। গুম হয়ে পড়ে আছেন নিজের শোবার ঘরে। ওদের খাওয়া-থাকার যাবতীয় ব্যবস্থা করল পুরনো দিনের চাকর—নটবর।

ভাগ্নেপ্রবর লুটুবাবু সারা জীবনে কাজ-কর্ম চাকরি-বাকরি কিছুই করেননি। প্রয়োজন হয়নি। ছেলেবেলা থেকে মামার অন্নধ্বংস করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন কাজ ছিল না তাঁর। তাই তিনি শখের আর্টিস্ট হতে চেয়েছিলেন। ছবি আঁকা, মডেল গড়া—এইসব নিয়েই তাঁর সময় কাটে। বাড়ির একতলায় তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য। তার নাম 'স্টুডিও'। সেখানে রাখা

আছে তাঁর ছবি আর মাটির মূর্তি। সেখানে তিনি কাউকে ঢুকতে দেন না। ভাগ্নেপ্রবরের ঐ ঝাঁকি-দর্শনের মধ্যেই হেবো চিনে ফেলেছে লোকটাকে। এমন কাঁচা-পাকা বেড়াল-গোঁফ কখনও কোন আর্টিস্টের হয়? তাই কি ওঁর স্টুডিও সর্বদা তালাবন্ধ?

হেবোর মা একবার তাঁকে আড়ালে ডেকে অসুখের কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন; কিন্তু ভাগ্নেপ্রবর কিছুই ভাঙলেন না। বোঝা গেল এঁদের আগমনে লুটুবাবু খুশি হতে পারেননি। অসুখের কথা জানবার জন্য মা যখন বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, তখন উনি শুধু বললেন—'টাকার গরম দিদি। বেশি টাকা থাকলে অমন শখের অসুখ অনেকেরই হয়!'

এরপর আর কথা চলে না। হেবোর মা ওদের দু-ভাইকে ডেকে বললেন —'দেখ, আমার সন্দেহ হচ্ছে তোদের দাদুর ঠিকমত চিকিৎসাই হচ্ছে না। তোদের উচিত, যে ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করছেন তাঁর কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নেওয়া। দরকার হলে তোদের বাবা অথবা মেসোকে টেলিগ্রাফ করে আনতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, লুটুকে আমার ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।'

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে পরদা সরিয়ে নটবর হুড়মুড় করে এসে পড়ে মায়ের পায়ের উপর। বলে—'আপনি ঠিকই ধরেছেন মা! বুড়ো কর্তা একেবারে বিন্-চিকিৎসেয় মারা যাচ্ছেন!'

এইবার একটা সূত্র পাওয়া গেল। নটবরের কাছ থেকে অসুখের একটা আদ্যোপান্ত ইতিহাস সংগ্রহ করা শক্ত হল না। মাসখানেক আগে এক রাত্রে রায়সাহেব নাকি ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। এ ঘটনা ঘটে তাঁরই ডিসপেন্সারি-ঘরে। তাঁকে ধরাধরি করে বাড়িতে আনা হয়। পরদিনই তাঁর প্রবল জ্বর আসে। আর এরপর থেকেই রায়সাহেব একেবারে বদলে গেছেন। সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকেন। কাছে লোক না থাকলে আঁতকে ওঠেন। শোবার ঘর ছেড়ে একেবারেই বার হন না। ওঁর বাইরের ঘরটা তালাবন্ধ করে ফেলে রেখেছেন তার পর থেকে। কাউকে ঢুকতে দেন না সে ঘরে। কেন, তা কেউ জানে না।

মেজদা বলে—'এ রকম হঠাৎ ভয় পাবার কারণটা কী?'

'আজ্ঞে বুড়ো-কর্তার দার্জিলিঙে একটা বাড়ি আছে। গরমকালটা তিনি প্রতি বছর সেখানে কাটিয়ে আসেন। সেবার সেখান থেকে তিনি নিয়ে এলেন একটা নেপালী দারোয়ান। মোহন থাপা। আমরা তাকে বলতাম বাহাদুর। সে থাকত ঐ পশ্চিমের ঘরটায়। একদিন কী হল —মোহন থাপা গলায় দড়ি দিয়ে মরল। তারপর থেকেই বাড়িতে নানান উৎপাত শুরু হল। দরজা জানলা ইচ্ছেমত খোলে, ইচ্ছেমত বন্ধ হয়। মাঝরাত্রে টিনের চালায় কারা যেন হেঁটে বেড়ায়। বুড়ো কর্তা দার্জিলিঙ থেকে ওর ছোট ভাইকে আনালেন। তার নাম কিশোর থাপা। বললে বিশ্বাস করবেন না, সে দেখতে হুবহু ওর দাদার মতো। লোকটা যেদিন এল বুড়োকর্তাই তাকে প্রথম দেখে আঁতকে উঠেছিলেন। পরে জানা গেল লোকটা বাহাদুরের প্রেতাত্মা নয়, যমজ ভাই। কিন্তু বুড়োকর্তা তাকে সহ্য করতে পারলেন না।

রাত-বিরেতে হঠাৎ তাকে দেখলেই উনি চমকে উঠতেন। মনে পড়েযেত তার দাদাকে। শেষে তিন মাসের মাইনে দিয়ে তাকে তিনি দার্জিলিঙের বাড়িতেই পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে তেনাদের অত্যাচার চলতেই লাগল। কত শান্তি-সস্ত্যেন করা হল। ডাক্তার মৈত্রই ব্যবস্থা করেছিলেন এসবের—'

'ডাক্তার মৈত্রটি কে?'— জিজ্ঞাসা করল হেবো।

'বুড়োকর্তাকে যিনি চিকিচ্ছে করেন আর কি। বিলাত-ফেরত আর জোয়ান বয়স হলে কি হবে, বামুনের ছেলে তো? গলায় পৈতেও আছে, ঠাকুর দেবতাকে ভক্তিও করেন। তিনিই পরামর্শ দিলেন শান্তি-সস্ত্যেনের। মায় গয়ায় পিণ্ডি পর্যন্ত দিয়ে আসা হল—কিন্তু তেনাদের দাপাদাপিটা কিছুতেই বন্ধ হল না।'

মেজদা প্রশ্ন করে—'কিন্তু বাইরের ঘরে কী আছে তাহলে?'

নটবর কি-একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে চুপ করে গেল। ঘরে এলেন লুটুবাবু। এসেই ধমকে দিলেন নটবরকে—'কি রে বেটা! এদের ভূতের গল্প শুনিয়ে ভয় দেখাচ্ছিস তো? চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব!'

হেবোর মা বলেন—'নটবরের দোষ নেই, আমরাই ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

লুটুবাবুর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বলেন—'তোমাদেরই বা ওসব কথায় থাকার দরকার কি? জ্যেঠা দেখতেই তো এসেছ দিদি, ভূত দেখতে তো আসনি!'

হেবো বুঝতে পারে ভিতরে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলেছে। এ ক্ষেত্রে দাদুকে রক্ষা না করলে তার অধর্ম হবে। ওসব ভূত-টুত সে মানে না। এসব আসলে কারও শয়তানি। কার হতে পারে? লুটুমামা, নটবর, কিশোর থাপা? বাড়িতে আর কে কে থাকে? কাউকে কিছু না বলে সে সুটকেস খুলে একে-একে তার সাজ-সরঞ্জামগুলো বার করে। মাপবার ফিতে, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, নোটবই, পেনসিল—

মেজদার মুখে খেলে গেল একচিলতে হাসি, বললে—'শার্লস হেবোর নাক-সুড়সুড়ানি শুরু হয়েছে!'

হেবো জবাব দিল না।

সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার মৈত্র পরীক্ষা করতে এলেন দাদুকে। হেবো তখন স্পষ্টই তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দাদুর অসুখটা কী?

লুটুবাবু ধমক দিয়ে ওঠেন —'তাতে তোমার কি দরকার হে ছোকরা?'

ডাক্তার মৈত্র তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—'আহাহা, রাগ করছেন কেন? ছেলেটি তো নেহাত ছোটও নয়, এবার হায়ার-সেকেণ্ডারি দেবে। ওদেরও কিছু-কিছু জানা দরকার।' তারপর হেবোর দিকে ফিরে বলেন —'তোমার দাদু একটা মানসিক অসুখে ভুগছেন। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছেন আর কি।'

হেবো আর কথা বাড়ায় না। সে বুঝতে পারে [illegible] লুকানো আছে ঐ তালাবন্ধ

ঘরে। ও-ঘরে দাদু কাউকে ঢুকতে দিচ্ছেন না কেন? ঐ ঘরটা সবার আগে ভাল করে সার্চ করে দেখা দরকার। কাজটা খুবই কঠিন। দাদু কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছেন—ও-ঘরে কেউ যাবে না। তালাবন্ধ ঘরের চাবিটা থাকে দাদুর বালিশের নিচে।

কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ-সিংহকে অত হতাশ হতে নেই। হেবো রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বসল দাদুকে সেবা করতে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে। হেবোর মা একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেলেন। খুশি হলেন—হেবো যে তার পাগলামি ছেড়ে দাদুর সেবায় মন দিয়েছে এতে মনে মনে উৎফুল্ল হলেন তিনি। ক্রমে ঘুমিয়ে পড়লেন দাদু। হেবোও উঠে যায়। বলা বাহুল্য ঐ ফাঁকে দাদুর বালিশের তলা থেকে একটি চাবি চলে আসে হেবোর পকেটে।

মধ্যরাত্রে সবাই যখন অঘোর ঘুমে অচেতন তখন হেবো চুপিসারে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। পা টিপে টিপে চলে আসে বাইরের ঘরে। তালা খুলে ঘরে ঢোকে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ বার হচ্ছে ঘরটা থেকে। হেবো আলো জ্বালল না। একটা টর্চের আলোয় ঘরখানা ভাল করে দেখল। ঘরটা মামুলিভাবে সাজানো। চেয়ার, টেবিল, আলমারি, সোফা। দেওয়াল-ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে সওয়া সাতটা বেজে। ক্যালেণ্ডারের পাতা ছেঁড়া হয়নি এ মাসে। গতমাসের পৃষ্ঠাটা প্রমাণ দিচ্ছে ঘরটা মাসাধিককাল অব্যবহৃত পড়ে আছে। সব আসবাব-পত্রে, মায় মেঝেতে ধুলোর একটা আস্তরণ। হেবো লক্ষ্য করে দেখে দাদুর সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দেরাজগুলো তালাবন্ধ। টেবিলের উপর কলমদানি, কাগজ-চাপা, কিছু ফাইলপত্র, একটা পিনকুশন, টেলিফোন-ডাইরেক্টরি, আর টেলিফোনটা নামানো আছে সেই ডাইরেক্টরির উপর। কাছে গিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে, টেলিফোনের মাউথ-পিসের উপর মাকড়সার জাল হয়েছে। অর্থাৎ অনেকদিন ধরেই ওটা ঐভাবে পড়ে আছে। নিশ্চয়ই দাদু শেষবার যখন এ ঘর তালাবন্ধ করে যান, মাসাধিক কাল আগে, তখন টেলিফোনটাকে রিসিভারের উপর রেখে যেতে ভুলে গেছেন। হেবো মনে করে দেখে, ওরা আসার পর বাড়িতে টেলিফোন একবারও বাজেনি। বাজবে কোথা থেকে? আজ এক মাসের উপর ওদের টেলিফোন সবসময় এনগেজড!

হেবো পকেট থেকে রুমাল বার করে হাতে জড়িয়ে নিয়ে আলগোছে টেলিফোনটা তুলে যথাস্থানে বসিয়ে দেয়। উল্লেখযোগ্য আর কিছুই পাওয়া গেল না ঘরে। ভূতের নামগন্ধও নেই। ঘর তালাবন্ধ করে চাবিটি আবার হেবো রেখে দেয় দাদুর বালিশের তলায়। সারা রাত বেচারির ঘুম হল না। কী হতে পারে? কেন এমন অহেতুক ভয় পেলেন দাদু? কে ভয় দেখালো? কী ভয় দেখালো, আর কেনই বা দেখালো?

হঠাৎ ভোর রাতে হেবোর ঘুম ভেঙে গেল। ও কিসের শব্দ? ঘুমের জড়িমা কেটে যেতেই হেবো বুঝতে পারে পাশের তালাবন্ধ ঘরে টেলিফোন বাজছে। হাতঘড়িটা তুলে নিয়ে দেখল রাত তখন সাড়ে তিনটে। এত রাত্রে কে টেলিফোন করছে? ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখে তালবন্ধ ঘরের কপাট খোলা। ভিতরে আলো জ্বলছে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসে হেবো।

দেখে দাদু ইতিমধ্যে উঠে এসে তালা খুলে ঘরে ঢুকেছেন। দরজার ফাঁক দিয়ে হেবো লুকিয়ে দেখতে থাকে।

দেখে, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে দাদু টেলিফোনে কথা বলছেন :

'কে তুমি? তুমিও রায়সাহেব? লায়ার! না তুমি রায়সাহেব নও! আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছ কেন! বল তুমি কে? . . . অ্যাঁ! কে? . . . তুমি? তোম? . . . ক্যয়সে তোম?'

হাত থেকে পড়ে গেল টেলিফোনটা। রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। হেবো চিৎকার করে ওঠে। লোকজন ছুটে আসে। মা, লুটুমামা, নটবর। ধরাধরি করে ওঁকে সবাই নিয়ে গেল তাঁর ঘরে।

কিছুদিন হল একটু সুস্থ হয়ে উঠছিলেন তিনি, আবার জ্বর এল পরদিন সকালে।

সকালবেলা শহরের সব কজন বড় ডাক্তারই দল বেঁধে দেখতে এলেন রায়সাহেবকে। অন্যান্য জুনিয়ার ডাক্তারেরা নিবারণচন্দ্রকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। অনেকেই খবর নিতে আসতেন সকাল সন্ধ্যায়। ডাক্তার মৈত্র সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে চিকিৎসা করছিলেন। ডাক্তার মৈত্র অবশ্য সবে ডাক্তারিতে ঢুকেছেন। অল্প বয়স। পলাশপুরে এসে নিবারণচন্দ্রের জুনিয়ার হিসাবে ঐ ডিসপেন্সারিতেই বসছিলেন। দাদুর অত বড় প্র্যাকটিসের ঠেলা সামলাতে ভদ্রলোক একেবারে প্রাণান্ত হয়ে পড়ছেন। সকালবেলা দেহাত থেকে দলে-দলে রুগী আসে এখনও ওঁর চেম্বারে। তাদের ঔষধ দিয়ে বিদায় করে—দাদুর পুরাতন কেসগুলি তাদের বাড়ি গিয়ে দেখে, তারপর বেলা দুটোই হোক তিনটেই হোক তিনি নিবারণবাবুকে দেখতে আসেন। দাদুকে পরীক্ষা করে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা শেষ করে তবে বাড়ি যান, স্নানাহার করেন। দাদু খুবই স্নেহ করেন এই জুনিয়ার ডাক্তারটিকে, আর তিনিও দাদুকে বাপের মত শ্রদ্ধা করেন। মাঝে মাঝে যেদিন ডাক্তার মৈত্রের বেশি বেলা হয়ে যায় সেদিন দাদু ওঁকে ধমক দেন—'এত বেলা হয়ে গেছে, এখনও তোমার স্নানাহার হয়নি? ও বেলায় এলেই পারতে!'

ডাক্তার মৈত্র জবাব দিতেন না। চুপচাপ পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন লিখতেন তিনি।

তবু কি জানি কেন হেবোর মা একটা অস্বোয়াস্তি বোধ করছিলেন। মেজদার সঙ্গে আড়ালে তিনি কী সব পরামর্শ করলেন। হেবো আন্দাজ করল সবই, কিন্তু ওঁরা যখন তাকে পরামর্শ করতে ডাকলেন না, তখন সেও ওপরপড়া হয়ে গেল না কথা বলতে। বেশ তো, ওঁরা যা ভাল বোঝেন করুন, হেবোও যা ভাল বুঝবে করবে।

পরদিনই অজিতেন্দ্রবাবু, মানে হেবোর মেসোমশাই এলেন মরণাপন্ন জ্যেঠশ্বশুরকে দেখতে। বোঝা গেল নিভৃত কক্ষে মা-মেজদার আলাপটা কী জাতের হয়েছিল। অজিতেন্দ্রবাবু পুলিসের দারোগা, এসেছেন কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। তাঁকে দেখে লুটুবাবুর মুখখানি কালো হয়ে গেল, বললেন—'একি, আপনি?'

—'হ্যাঁ, এলাম ওঁকে দেখতে।'

—'এত দেখার কি আছে তাও তো বুঝি না। মামা মিস ইণ্ডিয়াও নন্, তাজমহলও নন্! তবু এত এত লোক যে কেন দেখতে আসে কে জানে!' —বলেই বেরিয়ে যান তিনি।

অজিতেন্দ্রবাবুকে হেবোর মা আড়ালে ডেকে সমস্ত কথা বললেন। মেজদাও ছিল সে গোপন পরামর্শ-সভায়। হেবো ঘরে ঢুকতেই হেবোর মা বললেন—'আমরা একটু জরুরি কথা বলছি হেবো, তুমি বরং একটু পরে এস।'

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে হেবোর। বেশ মজা! এ সমস্যার সমাধান যার পক্ষে করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, তাকেই ওঁরা আমল দিতে চাইছেন না কেন? সে বয়সে ছোট বলে? সে মেজদার মত কলেজে ক্লাস করতে যায় না বলে? কিন্তু বয়সে ধেড়ে হলেই যে বুদ্ধিতে বেঁড়ে হবে না তারই বা নিশ্চয়তা কি? সেবার কাশী যাওয়ার পথে আবগারি পুলিসের বড়কর্তা সেই মুখার্জি-সাহেবকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন —আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে ঐ ছোট ছেলেটির কাছে ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবিশিতে পাঠাই! তা সেই মুখার্জি-সাহেবের বয়স কি হেবোর চেয়ে কম ছিল? বেশ, থাক, দরকার নেই! যা করার একাই করবে হেবো। কারও সাহায্য বা পরামর্শের প্রয়োজন নেই!

বাগানে নেমে যায় সে। পেয়ারাগাছ থেকে একটা ডাঁসামতন পেয়ারা পেড়ে ডালে পা ঝুলিয়ে জুত করে চিবোতে বসে। নিচু গলায় গান ধরে—'ও তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে, তা বলে ভাবনা করা চলবে না।'

পরদিন ডাক্তার মৈত্র যখন রায়সাহেবকে দেখতে এলেন, তখন হেবো, মেজদা আর অজিতেন্দ্রবাবু বসেছিলেন সেখানে। অজিতেন্দ্রবাবু ডাক্তার মৈত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেন, বলেন—'ডাক্তার মৈত্র, আপনি ডাক্তারি ব্যাগ ব্যবহার করেন না কেন? এ রকম একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছেন?'

ডাক্তার মৈত্রের হাতে ছিল একটা ক্যানভাসের ব্যাগ। পি-এ-এ মার্কা। অর্থাৎ প্যান-অ্যামেরিকান এয়ার-ওয়েজের এয়ার-ব্যাগ। সচরাচর ডাক্তারবাবুদের যেমন কালো ডাক্তারি-ব্যাগ হয়, তা নয়।

ডাক্তারবাবু বলেন—'এটাতে আমার হাত ধোবার তোয়ালে-সাবান ইত্যাদি থাকে। ডাক্তারি-ব্যাগ আমার গাড়িতেই আছে।'

বলতে বলতেই নিবারণবাবুর গাড়ির ড্রাইভার হাজিরা সিং ঘরে এল। তার হাতে কালো একটা চামড়ার ডাক্তারি-ব্যাগ। ডাক্তার মৈত্র সেই ব্যাগ থেকে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ আর শিশি বার করে নেন। রায়সাহেবকে ফুঁড়তে ফুঁড়তে বলেন—'বিলেত থেকে ফেরার সময় আর জাহাজে আসিনি, প্লেনে এসেছিলাম। ঐ ব্যাগটা তখন থেকেই আমার সঙ্গে আছে।'

হেবো ফস্ করে প্রশ্ন করে বসে—'আপনি বিলেত গিয়েছিলেন বুঝি?'

রায়সাহেব জবাব দেন—'মৈত্র এম. আর. সি. পি.। উফ্! ইন্ট্রাভেনাস দিলে নাকি?'

'না ইণ্ট্রাভেনাস নয়।' —বলেন ডাক্তার মৈত্র, দাদুর বাহুমূলটা ডলতে ডলতে।

হেবো আরো কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ধমক দিলেন লুটুবাবু—'তোমরা রুগীর ঘরে কেন?'

অজিতেন্দ্রবাবুর ইঙ্গিতে হেবো বেরিয়ে আসে। আর কিছু কথোপকথন সে শুনতে পায়

না। না পাক ক্ষতি নেই; শিকারী বিড়ালটিকে সে চিনতে শুরু করেছে ঠিকই। আপন মনে বাগানে পায়চারি করতে করতে হেবো গুন-গুন করে সুর ভাঁজে, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে।'

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো মডেলের কালো শেভ্রলেখানা। দাদুর অনেকদিনের গাড়ি। হেবো পায়ে পায়ে গেটের বাইরে বেরিয়ে এল। ড্রাইভারের সঙ্গে ভাব জমাতে চায় হেবো—'ড্রাইভারদাদা, আমাদের শহরটা একদিন দেখিয়ে আনলে না তো তুমি?'

হাজিরা সিং বলে—'কেয়া কিয়া যায় বোলিয়ে ছোটাসাব। মেরা তো মরণেকা ভি ফুরসৎ নেহি।'

তা বটে। হাজিরা সেই সাত-সকালে হাজিরা দেয়; গাড়ি বার করে আর সারাদিন তাকে টো-টো করে ঘুরতে হয়। অনেকদিনের পুরনো গাড়ি। আজ এটা কাল সেটা খুটখাট

মেরামতি লেগেই আছে, তবু এতদিন শুধু বাড়ি থেকে চেম্বার আর চেম্বার থেকে বাড়ি যাতায়াত করতে হত। বয়স হয়ে যাওয়ায় দাদু আজকাল আর দেহাতে কলে যেতেন না। যেটুকু রুগী দেখতেন তা ঐ চেম্বারে বসেই। বড়জোর শহরে দু-একটা পুরনো ঘরে রুগী দেখতে যেতেন। এখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডাক্তার মৈত্রকে ঠেকাতে হচ্ছে সেই রুগীর ঝামেলা। ড্রাইভারকেও ঘুরতে হচ্ছে সারাদিন। ডাক্তার মৈত্র তো আর বয়সের দোহাই দিতে পারেন না। ডাকলে রুগীর বাসায় গিয়েও দেখে আসতে হয়। ফলে বেচারি হাজিরা সিং-এর আর মরবার ফুরসৎ নেই।

হেবো প্রশ্ন করে একে-একে। হাজিরা সিং কতদিন কাজ করছে, চেম্বারে দাদুর কতজন কর্মচারী আছে, কে কেমন লোক। হাজিরা সিং তার ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে সব কথা বলে যায়। হাজিরা সিং পুরনো লোক। মোহন থাপার আগেই কাজে বহাল হয়েছে সে। তবে, নটবর তার থেকেও আগে এসেছে এ বাড়ি। কিশোর থাপা? সে তো এসেছে সবে। মোহন থাপা আত্মহত্যা করার পরে। দাদুর চেম্বারে আছেন জন-ছয়েক কর্মচারী। তাদের মধ্যে ভবেশ গাঙ্গুলী পুরনো লোক। পাশ-করা কম্পাউণ্ডার। হীরেন আর গোরাবাবুও পাশ-করা কম্পাউণ্ডার। ক্যাশ থাকে ভবেশবাবুর কাছে। আগে দাদু তাঁর কাছ থেকে দৈনিক ক্যাশ বুঝে নিতেন। এখন ডাক্তার মৈত্র সেটা বুঝে নেন। ডিসপেন্সারির যাবতীয় ঝামেলা একা মৈত্রকেই সামলাতে হয়। মৈত্র এসেছেন বছর-খানেক আগে। বেশ সজ্জন, সকলের সঙ্গেই ভাল ব্যবহার করেন। গোরাবাবু লোকটাকে হাজিরা সিং বরদাস্ত করতে পারে না। কেমন যেন চোর-চোর ভাব লোকটার। লুটুবাবু খুব বিশ্বাস করেন তাকে। হাজিরা সিং দেখেছে প্রায়ই গোরাবাবু এসে লুটুবাবুকে কি সব গুজুর-গুজুর করে বলে যায়।

রাত্রে অজিতেন্দ্রবাবু হেবোর মাকে বললেন—'ডাক্তার মৈত্রের কাছে সব কথা শুনলাম। আমার মনে হয় আপনারা ভুল আশঙ্কা করছেন। ভূতের ভয় ইচ্ছে করে কেউ ওঁকে দেখাচ্ছে না। কারই বা স্বার্থ হবে এভাবে ভূতের ভয় দেখাবার?'

মা কিন্তু যুক্তিটা মেনে নিতে পারেন না, বলেন—'ভূতের ভয় দেখাবার স্বার্থ হতে পারে তার, যে আশা করছে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলে এ সম্পত্তিটা তার হাতে আসবে।'

অজিতবাবু বলেন, 'বেশ তো, আমরা তো আরও কিছুদিন আছি। দেখাই যাক না পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়।'

মা বলেন—'কিন্তু ওঁকে আপাতত এখান থেকে সরিয়ে কলকাতা নিয়ে গেলে হয় না? এ বাড়িতে উনি আবার ভয় পেতে পারেন।'

'সে কথাও বলেছিলাম, কিন্তু লুটুবাবু রাজি নয়।'

'সে কেন রাজি নয়?'

'বলছে এক হাতেই চিকিৎসা হওয়া ভাল।'

হেবো সব কথা শুনল চুপিসারে।

অনেক রাত্রে হেবোর ঘুম ভেঙে গেল। দাদুর ঘরে কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। কান খাড়া করে খানিকটা শুনল হেবো। হ্যাঁ, ঠিকই। কথা বলছে কেউ। পা টিপে টিপে এ-ঘরের কাছে এসে উঁকি দিতেই হেবো দেখতে পেল—দাদু আর ওর মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু বসে কথা বলছেন। দাদু বলছিলেন—'বুঝলে অজিত, সেদিন থেকেই আমার মনে হল মোহন থাপার অতৃপ্ত আত্মাটা এ বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু আমি নই, হাজিরা সিং, নটবর—ওরাও বললে যে, অপদেবতার অস্তিত্ব ওরাও টের পেয়েছে। মৈত্র বললে একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে। পূজা অর্চনা সবই করা হল, কিন্তু অতৃপ্ত প্রেতাত্মার তৃপ্তি হল না। এই সময়, একদিন এমন একটা অদ্‌ভুত কাণ্ড ঘটল . . . '

ঘটনাটা আদ্যন্ত শুনে হেবোর মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। রায়সাহেব সন্ধ্যাবেলা ডিসপেন্সারিতে গেছেন। সেদিন সকাল থেকেই ওঁর শরীরটা খারাপ। আকাশের অবস্থাও খারাপ। টিপি-টিপি বৃষ্টি নেমেছে। রুগীদের বিদায় করে সন্ধে রাতেই বাড়ি ফিরে আসবেন স্থির করলেন। চেম্বারে ডাক্তার মৈত্র ছিলেন না। হীরেন, গোরা আর ভবেশবাবু ছিলেন। রায়সাহেব ডিসপেন্সারিতে ওঁর টেলিফোনটা তুলে নিলেন, ইচ্ছা, বাড়িতে ফোন করে গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে বলবেন। ফোন তুলে অপেক্ষা করতেই অপারেটর বলল—'ইয়েস?'

'নাম্বার থার্টিন প্লিজ।'

ওঁর বাড়ির নাম্বার তের, আর চেম্বারের নাম্বার চৌদ্দ।

প্রথমে রিঙিং টোন, এবং তার পরেই শুনলেন—'হ্যালো।'

'নাম্বার থার্টিন? রায়সাহেবের বাড়ি?' —প্রশ্ন করলেন রায়সাহেব।

'জী হাঁ, বোলিয়ে।'

একটু ঘাবড়ে গেলেন রায়সাহেব। বাড়িতে আছেন লুটুবাবু আর নটবর, হিন্দিতে তারা কথা বলবে কেন? তাই একটু অবাক হয়ে বলেন—'তুমি কে কথা বলছ?'

'আপ কৌন?'

'আরে আমি রায়সাহেব। তুমি কে? লুটু অথবা নটবরকে ডেকে দাও—'

'সালাম বড়সাব ম্যয় বাহাদুর।'

রায়সাহেবের হাত থেকে টেলিফোনটা পড়ে যায়। তখনও কিশোর থাপা কাজে লাগে নি। বাহাদুর বলতে তখন সকলে মোহন থাপাকেই বুঝত। আর সেই বাহাদুর তার দিন-দশেক আগে আত্মহত্যা করেছে।

তাঁকে ঐভাবে বসে পড়তে দেখে ভবেশবাবু ছুটে এসে বলল—'কী হয়েছে, স্যার?'

'কিছু না। তুমি একটা রিকশা ডেকে দাও।'

রিকশা করে বাড়ি ফিরে এসে রায়সাহেব দেখেন, লুটুবাবু বাড়ি নেই। নটবর বললে ইতিমধ্যে তাঁর বসার ঘরে কেউ ঢোকেনি। সে অবশ্য রান্নাঘরে ছিল। টেলিফোন বেজেছিল

কি না, তা সে জানে না। অবাক কাণ্ড! কাউকে কিছু না বলে নিজের ঘরে গিয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি কি ভুল শুনেছেন? অতগুলো কথা। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করেও ঘুম এল না। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বৃষ্টিটাও ঝেঁপে এসেছে। লক্ষণ ভাল নয়। রায়সাহেবের মনে হল একটু মেডিকেটেড ব্র্যাণ্ডি খেতে পারলে ভাল হত। মদ উনি খান না। ঘরে ব্র্যাণ্ডি নেই। কিন্তু ডাক্তারখানায় আছে। দেওয়াল-ঘড়িতে দেখেন, রাত দশটা। এখনও কি ডিসপেন্সারি খোলা আছে? দেখাই যাক না। তাই শোবার ঘর থেকে বসার ঘরে এসে ফোনটা তুলে নিলেন—উদ্দেশ্য, ডিসপেন্সারি খোলা থাকলে একটা ওষুধ এনে খাবেন। ফোনটা তুলে নিয়ে নাম্বার চাইলেন। ও-প্রান্ত থেকে ভারি গলায় শোনা গেল—'হ্যালো!'

'এটা কি নাম্বার ফোর্টিন? রায়সাহেবের ডিসপেন্সারি?'

'ইয়েস, স্পিকিং।'

'তুমি কে কথা বলছ?' প্রশ্ন করেন রায়সাহেব।

'তুমি কে কথা বলছ?' প্রতিধ্বনি করে যেন ও লোকটা।

'কে মৈত্র নাকি?'

'আঃ! বললাম তো এটা রায়সাহেবের ডিসপেন্সারি। আমি রায়সাহেব কথা বলছি। তুমি কে? কী চাও?'

রায়সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। হকচকিয়ে গিয়ে বলেন—'রায়সাহেব! কোন রায়সাহেব?'

ও প্রান্তের লোকটা ধমকে ওঠে—'ইডিয়ট! পলাশপুরে ক-জন রায়সাহেব আছে? আমি রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক কথা বলছি। তুমি কে হে ছোকরা?'

রায়সাহেব কোনও জবাব দিতে পারেন না। ফোন রেখে বসে পড়েন। মিনিটখানেক বোধহয় তাঁর জ্ঞান ছিল না। তারপর বুঝলেন, এসব নিশ্চয়ই কারও শয়তানি। কে হতে পারে? রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক একজন অত্যন্ত মানী লোক, তাঁকে 'ইডিয়েট' বলবার সাহস কার আছে? কিন্তু নাঃ, শরীর খারাপ বলে এসব বেয়াদবি বরদাস্ত করে যাওয়া চলে না। পাগলের মত লাফিয়ে উঠলেন উনি। ওঁর বসবার ঘরের সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এসে হাঁকলেন—'ড্রাইভার, গাড়ি নিকালো।'

বড় সাহেবের শরীর খারাপ শুনে গাড়ি গ্যারেজে তুলে রাখা হয়েছিল। আবার বার করা হল। রায়সাহেব সোজা গিয়ে উঠলেন ডিসপেন্সারিতে। ব্যাপারটা একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে। এখনই গিয়ে দেখলেন, ডিসপেন্সারির অন্যান্য কর্মচারীরা চলে গেছে। ডাক্তার মৈত্র শেষ রুগীটিকে বিদায় দিয়ে উঠবার উপক্রম করছেন। রায়সাহেব বলেন—'তুমি আছ ভালই হয়েছে। আচ্ছা, এর মধ্যে কেউ কোন ফোন করেছিল?

'আজ্ঞে না। আপনার টেলিফোন ছাড়া আর কারো ফোন তো আসেনি।'

'আমার ফোন এসেছিল? কে ধরেছিল?'

'আজ্ঞে আমি।'

'তুমি? তবে তুমি কী সব আজে বাজে কথা বলছিলে?'

ডাক্তার মৈত্র বলেন—'সে কি, স্যার? আমিও তো ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম আপনাকে। আমি যতবার বলছি—"আমি মৈত্র, কি চাইছেন স্যর" আপনি ততবারই শুধু বলছেন,—"আমি রায়সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাই।" আমি আপনার গলার স্বর শুনে বেশ চিনতে পারছিলাম, তাই যখন অবাক হয়ে বললাম—"রায়সাহেব মানে? কোন রায়সাহেব?" তখন আপনি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলেন—"ঈডিয়ট! পলাশপুরে ক-জন

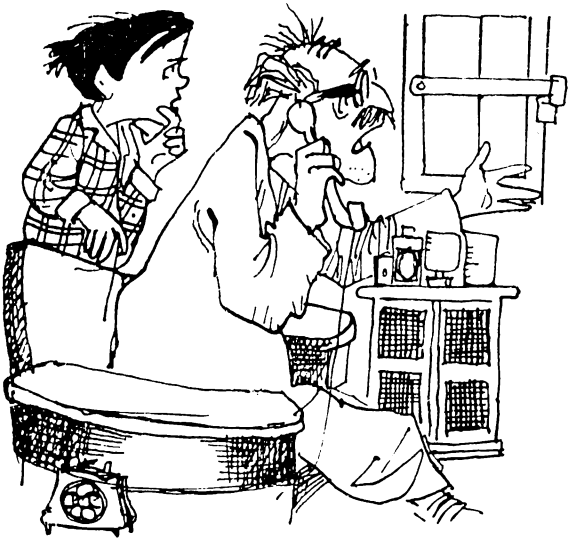

রায়সাহেব আছে? আমি ডাক্তার নিবারণ মৌলিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই।"

রায়সাহেব ক্রমেই দিশাহারা হয়ে যাচ্ছেন। তাহলে তিনি একাই ভুল শোনেননি! কে এমন করছে? কেনই বা করছে? মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত টেলিফোনটা তুলে নেন। বাড়ির নাম্বার চাইলেন আবার। নিশ্চিত জানেন, তালাবন্ধ ঘরে কেউ সাড়া দেবে না। রিঙিং টোন বেজেই যাবে। সেই রিঙিং টোনের আওয়াজটা না শোনা পর্যন্ত ওঁর যেন মুক্তি নেই।

কী আশ্চর্য! একবার বাজতেই ও-প্রান্তের সেই তালাবন্ধ ঘরে টেলিফোন রিসিভারটা কে যেন তুলে নিল। অস্ফুটে কে যেন বললে —হ্যাঁলো!'

সে স্বরে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ লেগে আছে।

রায়সাহেব শেষ সম্ভাবনাটা একবার হাতড়ে দেখতে চান : 'আপনার নাম্বার কত?'

ও প্রান্তবাসী ওঁর সেই শেষ অবলম্বনটা ধূলিসাৎ করে বললে—'তেঁর নাম্বার হজৌর!'

'আমি রায়সাহেব বলছি, তুমি . . . তুমি কে?'

'সেলাম বড়াসাব। ম্যয় বাঁহাদুর হুঁ!'

রায়সাহেব চিৎকার করে ওঠেন—'বাহাদুর! কৌন সা বাহাদুর?'

'মোহন থাপা বাঁহাদুর। হজৌর কা গোলাম, গরিবপরবর!'

রায়সাহেব নাকি আর সহ্য করতে পারেন না। এই উত্তর শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান তিনি। ডাক্তার মৈত্র ওঁকে বাড়ি নিয়ে আসেন। রায়সাহেবের জ্ঞান হয়েছিল পুরো দু-দিন পরে। তার পর থেকেই তিনি অসুখে ভুগছেন।

হেবো সমস্ত বিবরণটা শুনল। অজিতবাবু দাদুকে বললেন—'আপনি ও ঘরের চাবিটা আমাকে দেবেন একবার?'

'না না! ও ঘরে কেউ যাবে না তোমরা! ও ঘরে টেলিফোন আছে।'

দিন-তিনেক পরে কলকাতা থেকে হেবোর মেসো অজিতেন্দ্রবাবুর এক বন্ধু এলেন। উনি নাকি লাইফ ইন্সিওরেন্সের অর্গানাইজার। পলাশপুরে এসেছিলেন নিজের কাজে। অজিতেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যায়। অজিতেন্দ্রবাবুই তাঁকে ধরে এনেছেন এ বাড়িতে। ভদ্রলোকের নাম প্রবীর মুখার্জি। তাঁকে দেখে লুটুবাবু আরও বিরক্ত হলেন। এ কি, তামাসা দেখতে লোক জুটছে নাকি? কিন্তু অজিতেন্দ্রবাবু কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

হেবো বাইরের ঘরে ঢুকে দেখে, পাইপমুখো ভদ্রলোকটি বসে ওর মেসোমশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছেন। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। মাথার চুলগুলি উলটানো। সুট পরে আছেন তিনি। মেসোমশাই বলেন—'এঁকে প্রণাম কর হেবো, ইনি হচ্ছেন . . . '

ভদ্রলোক তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—'এস খোকা, আমার নাম প্রবীর মুখার্জি, তোমার মেসোমশায়ের বন্ধু আমি। এদিকে একটা ইন্সিওরেন্স কেসে এসেছিলাম, শুনলাম তোমরা এখানে আছো, তাই ভাবলাম—'

তাঁকে বাধা দিয়ে হেবো বলে—'আপনাকে কী বলে ডাকব? ডিটেকটিভ কাকা?'

ভদ্রলোকের বাক্যস্ফূর্তি হল না। চোয়ালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়ল শুধু। একটু সামলে নিয়ে ঢোক গিলে বলেন—'সে কি? ও কথা কে বললে? আমি তো ডিটেকটিভ নই! ও রকম অদ্‌ভুত কল্পনা করলে কেন?'

'কল্পনা?' হাসল হেবো, বললে—'আজ্ঞে না। আমি কল্পনা করে কোন সিদ্ধান্ত নিই না। আমার সিদ্ধান্ত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত! আজই একজন গোয়েন্দা এ বাড়িতে আসবেন এটা অনুমান করেছিলাম আমি। মেসোমশাই পুলিসের দারোগা। এসব ক্ষেত্রে ডিটেকটিভের উপর তিনি সচরাচর নির্ভর করে থাকেন, কিন্তু সেটা তো হচ্ছে অনুমান। আপনি ধরা পড়ে গেলেন দুটি কারণে। প্রথমত মেসোমশাইকে আপনার পরিচয় দেবার সুযোগ না দিয়ে বড় তাড়াহুড়ো করেছেন আপনি। আমার মত বাচ্চা ছেলের কাছে আপনার এ বাড়িতে আসার

কৈফিয়ত দেবার তো প্রয়োজন ছিল না। পরিচয়টা গোপন করার জন্য আপনার মনে যে অপরাধ বোধ ছিল তারই তাগিদে এক নাগাড়ে আপনি অহেতুক অনেক কথা বলে গেছেন। তাছাড়া আপনি চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে গেছেন আপনার বুকপকেট থেকে উঁচু হয়ে থাকা ঐ ম্যাগনিফাইং গ্লাসে। বীমা কোম্পানির লোকের পক্ষে ওটা বেমানান।'

প্রবীরবাবুর চোখের মণিদুটো ট্যারা হয়ে গেল!

অজিতেন্দ্রবাবু বলেন—'ওর কাছে লুকিয়ে পার পাবে না, প্রবীর! ও একটি ক্ষুদে গোয়েন্দা! ওর কীর্তির কথা তোমাকে পরে বলব আমি। এখন এস, আলোচনা করা যাক।'

হেবোর মত একটি হাফ-প্যান্টধারীর সঙ্গে রহস্যের আলোচনা করতে হবে শুনে প্রবীরবাবু গুম মেরে গেলেন।

হেবো বললে—'প্রবীরকাকা, আমার প্রথম পরামর্শ হচ্ছে, আপনি আপনার পরিচয়টা পালটান। বীমা কোম্পানীর দালাল নয়, আপনি নিজেকে পামিস্ট বলে পরিচয় দিন।'

'কেন?'

'বীমা কোম্পানির দালালের চেয়ে তাতে অনেক সুবিধা। সন্দেহভাজন যে-কজন লোক আছেন—লুটুমামা, গোরাবাবু, নটবর, ভবেশবাবু এঁদের হাত দেখার অছিলায় নানান প্রশ্ন করতে পারবেন।'

প্রবীরবাবু হেসে বলেন,—'ছেলেমানুষ! তাতে কী লাভ? আসল অপরাধী তো মিথ্যেই বলবে।'

কিন্তু অনেক সময় উল্টোপাল্টা মিথ্যার ভিতর থেকেই ক্লু পাওয়া যায়। তাছাড়া এ কেসে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে ধুলোভর্তি বাইরের ঘরের ঐ টেলিফোনটা ভবিষ্যতে হয়ত ফিঙ্গার প্রিন্টস্ নিয়ে আমাদের গবেষণা করতে হবে। পামিস্ট, মানে হস্তরেখাবিদের পক্ষে তার ম্যাগনিফাইং গ্লাসটার সাহায্যে হাত-দেখার অছিলায় আঙুলের ছাপের নকল তুলে নেওয়া সহজ।'

প্রবীর বুঝতে পারেন, হাফপ্যান্ট পরলেও ছেলেটির মাথাটি পাকা।

অজিতেন্দ্রবাবু আর হেবো ছাড়া প্রবীরবাবুর আসল পরিচয়টা আর কেউ জানতে পারল না, এমনকি হেবোর মা-ও নয়। হেবো মনে মনে খুশি হল। মেসোমশাই তাহলে ওকে ভরসা করতে শুরু করেছেন। অবশ্য এও সে বুঝতে পারে, নিজে-নিজেই প্রবীরবাবু পরিচয়টা আবিষ্কার করেছিল বলে বাধ্য হয়ে তাকে দলে টেনেছেন মেসোমশাই। সেদিনই প্রবীরবাবু বাইরের ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি করালেন। স্থির হল, রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ওঁরা তিনজনে ঘরটা পরীক্ষা করে দেখবেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার মৈত্র এসে অজিতেন্দ্রবাবু আর প্রবীরবাবুকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বললেন—'কয়েকটা কথা আপনাদের বলতাম। আমার মনে হয় ব্যাপারটা ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখা উচিত।'

প্রবীরবাবু বলেন—'কিসের কথা বলছেন আপনি?'

'ঐ টেলিফোনে ভূতের গলার বিষয়ে। আমার মনে হয় কেউ ইচ্ছে করে ওঁকে ভয় দেখাচ্ছে।'

'কিন্তু বুড়ো মানুষকে অহেতুক ভয় দেখিয়ে কার কী লাভ?'

ডাক্তারবাবু একটু ইতস্তত করে বলেন—'অহেতুক বলে এটাকে ধরে নিচ্ছেন কেন? এই করে হয়ত তাঁর মৃত্যুকে আগিয়ে আনা হচ্ছে। রিভলভারের গুলি, অথবা বিষের সাহায্য না নিয়েও তো মানুষ খুন করা যায়।'

অজিতবাবু বলেন—'তা যায় বৈকি। আমি পুলিসে চাকরি করি। অনেক কিছুই দেখেছি আমি। কিন্তু কার স্বার্থ আছে এ বিষয়ে?'

'শুধু স্বার্থ নয়, স্বার্থ ও সুযোগ। "মোটিভ" আর "অপারচুনিটি"। কিন্তু সেটা আমার-আপনার পক্ষে বিচার করার চেয়ে কোনও প্রফেশনাল ডিটেকটিভের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয় কি?'

অজিতবাবু বলেন—'বেশ, ভেবে দেখি।'

'আমি আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে দুটি কাজ করেছিলাম। তার ফলাফলটা জানিয়ে রাখি। প্রথমত, টেলিফোন ডাইরেক্টারিতে "অবনকৃশাস কল" অথবা "গোস্টস কল" বলে একটা অনুচ্ছেদ আছে, দেখে থাকবেন। ডাইরেক্টারির নির্দেশ অনুসারে আমি ট্র্যাফিক সুপারকে চিঠি লিখি। তাঁরা এ বিষয়ে আদ্যোপান্ত অনুসন্ধান করে দেখেছেন। কোনও সূত্র পান নি। দ্বিতীয়ত, টেলিফোন লাইনটা একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত মনে করেছিলাম। সে ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র লুটুবাবু একজন মিস্ত্রি ডেকে সমস্ত লাইনটা পরীক্ষা করান। লাইন কেউ ট্যাপ করছে না, বা লাইনে কোনও ফল্ট নেই। তবে মনে রাখবেন, মিস্ত্রি লাগিয়েছিলেন লুটুবাবু, এবং রিপোর্টটাও তাঁরই।'

অজিতবাবু গম্ভীরভাবে বলেন—'অশেষ ধন্যবাদ। আপনি আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছেন।'

ডাক্তার মৈত্র প্রতিবাদ করেন—'কিছু না, কিছু না। রায়সাহেবকে আমি আমার বাবার মতো শ্রদ্ধা করি। তাঁকে রক্ষা করবার জন্য আমি সবরকম সাহায্য করতে সর্বদাই প্রস্তুত।'

রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে অজিতবাবু, প্রবীরবাবু আর হেবো ডুপ্লিকেট চাবির সাহায্যে এ ঘরে এলেন। প্রবীরবাবু কলকাতায় একটা টেলিফোন বুক করলেন। অল্প পরেই যোগাযোগ হল। কলকাতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেরিয়ে এলেন ওঁরা।

রিসিভারের উপর ফোনটা বসানো রইল। রায়সাহেবকে ঘর বদলিয়ে দূরের একখানা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। যাতে টেলিফোন বাজলেও তিনি শুনতে না পান। রাত্রে আর কিছু হল না। সকালে একটা টেলিফোন এল। হেবো ধরল। না, কোনও ভূতের গলা নয়। ডাক্তার মৈত্র টেলিফোনে জানতে চাইলেন, রায়সাহেব কেমন আছেন। হেবো জানায়, ভাল আছেন,

ঘুমোচ্ছেন। আশ্চর্য, টেলিফোনে আর কোনও বিভ্রাট হল না! এখানে ওখানে অকারণে চার-পাঁচবার টেলিফোন করা হল। ঠিকমতই কথা বলা গেল। ও-প্রান্ত থেকে কোন ভূতুড়ে গলা শোনা গেল না। না কোন রায়সাহেব, না কোন বাহাদুর। প্রবীরবাবু তাঁর পরিচিত একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে দিয়ে টেলিফোন লাইনটা পরীক্ষা করালেন। না, কোনও গণ্ডগোল নেই লাইনে। কেউ ট্যাপ্ করছে না।

রায়সাহেব ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। আরও তিন চারদিন প্রবীরবাবু থেকে গেলেন, যদিও প্রায় প্রতিদিনই লুটুবাবু তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—'কি, আপনার পলাশপুরে কাজ মিটল?'

আর কোন গণ্ডগোল হচ্ছে না দেখে প্রবীরবাবু ফিরে যাওয়াই স্থির করলেন। অজিতেন্দ্রবাবুকে ডেকে বলেন—'আমার মনে হয় রায়সাহেব যা বলেছিলেন তা হয় মিথ্যে, না হয় তাঁর কল্পনা। ইচ্ছা করে বুড়োমানুষ মিথ্যা কথা বলবেন কেন? সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভয়ে আতঙ্কে তিনি ভুল শুনেছিলেন। এ ছাড়া এ সমস্যার কোন লজিক্যাল সমাধান হতে পারে না। এই একমাত্র ব্যাখ্যা।'

অজিতেন্দ্রবাবু বলেন—'এর চেয়ে ভাল ব্যাখ্যা যখন নেই, তখন তাই মেনে নিতে হবে।'

হেবো বললে—'কিন্তু ব্যাখ্যা তো স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়! প্রথমত, ভূতের কণ্ঠস্বর দাদু একা শোনেননি, ডাক্তার মৈত্রও শুনেছেন। দ্বিতীয়ত, টেলিফোন ছাড়াও ভূতের দাপাদাপি এ বাড়িতে হয়েছে। জানলাগুলো আপনা-আপনি খুলে গেছে, রাত্রে কে বা কারা টিনের চালে হেঁটে বেড়িয়েছে। এ তো সবাই বলছে।'

হঠাৎ পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকেন লুটুবাবু। ধমকে ওঠেন হেবোকে —'না হে ছোকরা, ভূতের দাপাদাপির কথা সবাই বলছে না। আমিও এ বাড়িতে থাকি, একদিনের তরেও ভূতের কোন দাপাদাপি টের পাইনি এতদিন।'

তারপর অজিতেন্দ্রবাবুর দিকে ফিরে বলেন—'তবে দিনকয়েক ভূতের কিছু উপদ্রব টের পাচ্ছি বটে।'

অজিতেন্দ্রবাবু ঝুঁকে পড়েন সামনের দিকে, বলেন—'কদিন হল কী দেখছেন?'

দেখছি এই ভূতটিকে। বিচ্ছু ভূত। গভীর রাতে এ ছোকরা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়ায়। আপনাকে আমি মিনতি করছি অজিতবাবু, রোগীর বাড়ি থেকে এ সব ছেলে-ছোকরাদের হটান।'

বলেই বেরিয়ে যান তিনি। উনি ঐ রকমই অদ্ভুত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ওঁরা তিনজনে ডিসপেন্সারিতে এসে ডাক্তার মৈত্রের সঙ্গে দেখা করলেন। অজিতেন্দ্রবাবু বলেন—'আমরা এবার ফিরে যাব ভাবছি ডাক্তার মৈত্র। আর তো গণ্ডগোল হচ্ছে না!'

ডাক্তার মৈত্র বলেন—'ঐ সঙ্গে রায়সাহেবকেও নিয়ে যান না। কিছুদিন বাইরে থেকে

ঘুরে এলে একটা চেঞ্জ হবে।'

প্রবীরবাবু বলেন—'সেকি!'

লুটুবাবু বললেন—'ওঁকে স্থানান্তর করায় তো আপনার অনিচ্ছা?'

হেসে ডাক্তার মৈত্র বলেন—'আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা তো আমার মুখ থেকেই শুনছেন।

প্রবীরবাবু গুম মেরে গেলেন।

হেবো বললে—'টেলিফোনটা সারেণ্ডার করলে কেমন হয়?'

ডাক্তার মৈত্র আপত্তি জানিয়ে বলেন—'আমার তাতে আপত্তি আছে। দুটো কারণে। প্রথমত, লাইন একবার নিজে থেকে কাটিয়ে দিলে দ্বিতীয়বার পাওয়া আজকাল অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, তাহলে রায়সাহেব কোনদিনই নর্ম্যাল হবেন না। টেলিফোনে স্বাভাবিকভাবে ওঁকে কথা যেদিন বলাতে পারব সেদিনই বলব উনি সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন।'

প্রবীরবাবু বলেন—'তা ঠিক। তবে আমার মনে হয় ভূতের ভয় কেউ ওঁকে জোর করে দেখাচ্ছে না।'

ডাক্তার মৈত্র বলেন—'আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না প্রবীরবাবু। আপনারা একজন প্রফেশনাল ডিটেকটিভ নিয়োগ করলেই বোধহয় ভাল করতেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রায়সাহেবকে কেউ ইচ্ছা করেই ভয় দেখাচ্ছে। "মোটিভ" আর "অপারচুনিটি" বিচার করে আমি আন্দাজও করেছি আসল অপরাধীটি কে। কিন্তু আমার পক্ষে তাঁর নাম উচ্চারণ করা ঠিক নয়। প্রমাণ তো নেই আমার!'

পরদিন প্রবীরবাবু বললেন—'আর ভূতের খেলা হবে না। আজ আমি ফিরে যাব।'

অজিতেন্দ্রবাবুও আর আপত্তি করতে পারলেন না।

যাবার সময় হেবো প্রবীরবাবুর হাতে একটা বন্ধ খাম এনে দিল। বললে—'আপনি বলেছেন এ বাড়িতে আর ভূতের খেলা হবে না। আমার বিশ্বাস—শীঘ্রই তা হবে। দিন-সাতেকের মধ্যেই আপনাকে আবার ফিরে আসতে হবে এখানে। এই খামের মধ্যে একটা চিঠি রইল। কলকাতা পৌঁছে চিঠিখানা পড়বেন আপনি। আপনাকে যে-দুটি অনুরোধ করেছি দয়া করে সে দুটি রাখবেন।

প্রবীরবাবু জানতেন যে ছেলেটি ইঁচড়ে পাকা। ডেঁপো মস্তান একটি! আন্দাজে একবার একটি আফিং-চোরের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছিল বলে ওর সেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। তিনি কোন কথা না বলে বন্ধ খামটা পকেটে ফেলে কলকাতায় ফিরে গেলেন।

ঘটনাটা ঘটল তার দিন-পাঁচেক পরে। বাইরের ঘর থেকে একটা আর্ত চিৎকার শুনে বাড়িসুদ্ধ সবাই ছুটে এসে দেখে, রায়সাহেব তাঁর বাইরের ঘরের চেয়ারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। কোলের উপর পড়ে আছে টেলিফোনটা। বেশ বোঝা গেল, দীর্ঘদিন কোনও গণ্ডগোল না হওয়ায় সাহস করে দাদু আজ টেলিফোন করেছিলেন। আর তখনই, হয় মোহন থাপা, নয় রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক ও-প্রান্ত থেকে টেলিফোনে সাড়া দিয়েছিলেন।

দাদুকে আবার ধরাধরি করে শুইয়ে দেওয়া হল তাঁর বিছানায়। অজিতেন্দ্রবাবু ডাক্তার মৈত্রকে ডাকতে লোক পাঠাচ্ছিলেন। বাধা দিল হেবো। বললে—'না মেসো, ডাক্তার মৈত্র নয়, অন্য কোনও ডাক্তার।'

অজিতেন্দ্রবাবু একটা অবাক হয়ে বলেন—'কেন রে?'

হেবো বললে—'এ রহস্যের কিনারা হয়ে এল বলে। আপনি বরং অন্য কোনও ডাক্তার ডাকুন।'

লুটুবাবু বলেন—'বেশ তো, ডাক্তার বোস তো পাশেই থাকেন। তাঁকেই ডাকা যাক।'

ডাক্তার বোস এসে দাদুকে পরীক্ষা করে ঔষধ দিলেন। জানালেন—না, ভয়ের কিছু নেই। তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন ক্রমশ।

ঔষধ দেবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই দাদু একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। হেবোর মা তখন হেবোকে আড়ালে ডেকে বলেন—'হ্যাঁরে হেবো, তোর রহস্যের কিনারা হবার কথা কী বলছিলি তখন?'

মেজদা বলে—'বাদ দাও মা পাগলটার কথা!'

হেবো বলে—'আর একটা দিন সবুর কর, মা। প্রবীরকাকুকে টেলিগ্রাফ করেছি। কাল সকালেই তিনি এসে যাবেন। তখনই জানতে পারবে সবাই।'

সন্ধ্যাবেলাতেই প্রবীরবাবু এলেন। এসেই জড়িয়ে ধরেন হেবোকে। বলেন—'অদ্‌ভুত তোমার সত্যান্বেষণ! কিন্তু কী করে তুমি বুঝলে সব?'

বিস্মিত হয়ে অজিতেন্দ্রবাবু বলেন—'কী [illegible]'

প্রবীরবাবু বলেন—'সমস্ত রহস্যের কিনারা [illegible] গেছে। আর, তা সম্ভব হয়েছে এই ক্ষুদে গোয়েন্দাটির জন্য। কেমন করে আন্দাজ করেছে তা এখনও জানি না, তবে স্বীকার করব—অদ্‌ভুত ওর ক্ষমতা।'

হেবোর মা বলেন—'তার মানে, আর ভূতের গলা টেলিফোনে শোনা যাবে না?'

প্রবীরবাবু বলেন—'না। কারণ যে ভূত টেলিফোনে ভেল্কি দেখাতো বর্তমানে সে জেল-হাজতে। সত্যি হেবো, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, এ রহস্যের কিনারা তুমি করতে পারবে। কিন্তু এখন স্বীকার করছি তা তুমি করেছ। কী করে যে করেছ—'

অজিতেন্দ্রবাবু বাধা দিয়ে বলেন—'আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

প্রবীরবাবু বলেন—'দাঁড়ান বুঝিয়ে বলি। এখান থেকে ফিরে যাবার সময় হেবো আমার হাতে একখানা চিঠি দেয়। বন্ধ খাম, উপরে আমার নাম লেখা। আমি ভেবেছিলুম, এসব ওর ছেলেমানুষি—'

বাধা দিয়ে হেবো বলে—'একটা কথা। ডাক্তার মৈত্র এখন কোথায় প্রবীরকাকু?'

'থানায়।'

থানায়!'— বিস্মিত হয়ে সবাই প্রশ্ন করে একসঙ্গে—'কেন?'

'সেই কথাই তো বলছি। হেবোর চিঠিখানা আমি কলকাতায় গিয়ে খুলে পড়ি। তাতে হেবো আমাকে দুটি অনুরোধ করেছিল। ওর আফিং চুরির কেসটা শোনার পর ওকে আর একেবারে উপেক্ষা করতে পারিনি আমি। তাই ওর কথামত একজন ডিটেকটিভকে পাঠাই এখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। আর বিলাতেও টেলিগ্রাফ করি। কাল তার জবাব পেলাম। গত বিশ বছরের ভিতর অতুলকৃষ্ণ মৈত্র নামে কেউ এম. আর. সি. পি. হয়নি। এখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস থেকেও খবর গেল যে, এখানকার একজন অপারেটর ফণী নাগ রায়সাহেবের টেলিফোনে ভূতের খেলা দেখাচ্ছে। ঠিক তার পরেই পেলাম শ্রীমান হেবোর টেলিগ্রাফ। তাই টেলিফোন অপারেটর ফণী নাগ আর ডাক্তার মৈত্রের নামে বডি-ওয়ারেন্ট করিয়ে এখানে চলে এসেছি। ওঁদের দুজনকে এইমাত্র পুলিসের জিম্মায় পৌঁছে দিয়ে আসছি। কিন্তু হেবো যে কী করে কি করল তা আমি এখনও জানি না।'

হেবো উঠে দাঁড়ায়। দু-হাত হাফ-প্যান্টের দুই পকেটে সেঁদিয়ে হেসে বলে—'দেখুন প্রবীরকাকু, আমি আন্দাজে, কিছুই করি না। আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, ভূত আমি মানি না। সুতরাং এ কারও শয়তানি। এখন ভেবে দেখতে হবে, শয়তানি করার স্বার্থ কার হতে পারে? অর্থাৎ অপরাধীর মোটিভটা কী? আমি বিশ্লেষণ করলাম—দাদুর এই দীর্ঘদিনের অসুখে কে লাভবান হচ্ছে? উত্তর একটিই। একমাত্র ডাক্তার মৈত্র। আর কারও কোন লাভ নেই। দাদুর অসুখে একজন মাত্র মানুষ লাভবান হচ্ছেন। ডাক্তার মৈত্র দাদুর জুনিয়র হিসাবে কাজ করছিলেন, দাদু শয্যাশায়ী হয়ে পড়ায় তাঁর সম্পূর্ণ পশারটা তিনি দখল করেছেন। প্রচণ্ড খাটুনি বেড়ে গেছে তাঁর, এ কথাই আমরা বলাবলি করেছি—ভেবে দেখিনি তাঁর রোজগারটাও বেড়ে গেছে প্রচণ্ডভাবে। অথচ সব মূলধন দাদুর। ডিসপেন্সারি দাদুর, আলমারিভরা ওষুধ দাদুর, মাইনে-করা কম্পাউণ্ডারগুলি দাদুর, পশারটা দাদুর—মায় সেদিন তিনি যে অম্লানবদনে বললেন—ডাক্তারী ব্যাগ "আমার" গাড়িতে আছে, সেই "আমার" গাড়িখানাও দাদুর—চলে দাদুর অ্যাকাউণ্টে পেট্রলস্লিপ কেটে! লক্ষ্য করলে বোঝা যায়—দাদু যতদিন বিছানায় পড়ে থাকবেন, ততদিনই ডাক্তার মৈত্র দু-হাতে টাকা লুঠবেন।

'বেশ, এবার ডাক্তার মৈত্রর চরিত্রটাকে দেখি। উনি নাকি একজন বিলাত-ফেরত এম. আর. সি. পি. ডাক্তার। অথচ প্র্যাকটিস শুরু করলেন একজন মফস্বলের ডাক্তারের জুনিয়র হিসাবে। সত্যি সার্টিফিকেট থাকলে তিনি কি ভাল চাকরি পেতে পারতেন না?

'এবার দেখা যাক কেমনতর ডাক্তার উনি। আমি লক্ষ্য করে দেখি, তিনি দাদুকে যখন ইনজেকশন দিলেন তখন দাদু বললেন, "উঃ! ইণ্টাভেনাস দিলে নাকি? বড্ড লাগল যে!" উত্তরে তিনি বললেন—'না!' একটা সাধারণ ইনজেকশনে দাদুর এত ব্যথা লাগল কেন? একজন বিলাত-ফেরত এম. আর. সি. পি. ডাক্তারের হাত এত কাঁচা?

'তৃতীয়ত, লক্ষ্য করে দেখলাম, প্রবীরকাকু আসার পরেই ডাক্তার মৈত্র সতর্ক হয়ে উঠলেন। পাছে আমরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে 'অবনকাশ কল'-এর কথা জানাই তাই

আগে থেকেই তিনি জানিয়ে দিলেন ওটা তিনি ইতিপূর্বেই করে রেখেছেন। সন্দেহটা যাতে অন্য খাতে প্রবাহিত হয় তাই উনি "মোটিভ" আর "অপারচুনিটি"র প্রসঙ্গ এনেছিলেন।'

অজিতেন্দ্রবাবু বলেন, 'কিন্তু টেলিফোন?'

'সেটা তো আরও সোজা। লাইনে যখন গণ্ডগোল নেই—কেউ যখন লাইন ট্যাপ করছে না, তখন তালাবন্ধ ঘরে টেলিফোন করলে কে কথা বলতে পারে? —একমাত্র অপারেটর ছাড়া?

'কিন্তু শুধু রায়সাহেব ফোন করলেই গণ্ডগোল হয়, অন্য কেউ করলে হয় না কেন? আর কেউ তো ভূতের সঙ্গে কথা বলেনি কোন দিন?'

'বলেছে। আপনারা ভুলে গেছেন। অথবা ঘটনার পারম্পর্য মন দিয়ে লক্ষ্য করেননি। ডাক্তার মৈত্র দাদুকে প্রথম দিনই বলেছিলেন যে, তিনিও টেলিফোনে ভূতুড়ে কথাবার্তা শুনেছেন। এজন্য ডাক্তার মৈত্রকে আরও বেশি সন্দেহ করতে বাধ্য হয়েছি আমি। কারণ দাদু ছাড়া যে দু-জন লোক টেলিফোনে ভূতবাবাজীবনের সঙ্গে কথা বলেছে তার মধ্যে ডাক্তার মৈত্র একজন।'

প্রবীরবাবু বাধা দিয়ে বলেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। কী বললে? দু-জন? আবার কে ভূতের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছে?'

'আমি বলেছি। মৃত মোহন থাপার সঙ্গে আমারও কিঞ্চিৎ আলাপচারী হয়েছে টেলিফোনে।'

'সে কি! কবে?'

'আপনি যে-রাত্রে ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে ঘরে ঢুকলেন, তার পরদিন সকালে। আপনি কলকাতায় ট্রাঙ্ক কল করলেন। চার-পাঁচটা কল করলেন। তারপর কথাবার্তা শেষ করে চলে গেলেন। সকালবেলা চুপিচুপি আমি ঘরে ঢুকি। আবার টেলিফোন তুলি এবং ডিসপেন্সরির নাম্বার চাই। ফোন ধরে মৃত মোহন থাপা।'

'কী আশ্চর্য!'— বলেন প্রবীরবাবু।

'মোটেই না। আপনারা ঠিক কায়দা করতে পারছিলেন না বলে ভূতের সাক্ষাৎ পাননি। দাদুর সত্তরের কাছাকাছি বয়স—দাঁত পড়ে গেছে। তাই বাবা-মুস্তফার মত কাঁপা-কাঁপা গলায় নাম্বার চাইলাম। ওপাশ থেকে যেই বলল "হ্যালো", অমনি বললাম, আমি রায়সাহেব কথা বলছি। তুমি কে? মৈত্র?' জবাব পেলাম—'নেহি বড়া সাব। সেলাম! ম্যয় বাহাদুর!' আর্তনাদ করে উঠলাম—'কোন সা বাহাদুর?' ও-প্রান্তবাসী বললে—'মোহন থাপা বাহাদুর, গরিবপরবর!'

'আর্তনাদ করে টেলিফোন রেখে দিলাম। আর তার দশ মিনিটের মধ্যেই অপরাধী চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে গেল!'

'দশ মিনিটের মধ্যে! মানে? কেমন করে?'

'তার মিনিট-দশেক পরেই ডাক্তার মৈত্র টেলিফোন করে জানতে চাইলেন রায়সাহেব কেমন আছেন। আর তৎক্ষণাৎ তিনি চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে গেলেন।'

'কেমন করে? এটা তো একটা কোয়েন্সিডেন্সও হতে পারত?'

'না, পারত না। কারণ ডাক্তার মৈত্র জানেন—আজ দু-মাস ধরে এ বাড়ির বাইরের ঘর তালাবন্ধ। চাবি দাদুর বালিশের তলায় থাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি জানেন এ ঘরে টেলিফোন রিসিভার রাখা থাকে না। তাহলে তিনি কোন আক্কেলে অপারেটরের কাছে এ বাড়ির নাম্বার চান? এ বাড়ির টেলিফোন যে রিসিভারের উপর রাখা আছে—সে কথা জানতাম আমরা মাত্র তিনজন— প্রবীরকাকু আপনি, মেসোমশাই আর আমি—আর ন্যাচারালি টেলিফোন অপারেটর। ডাক্তার মৈত্রের তো সে-কথা জানা নয়! তিনি কোন আক্কেলে এ নম্বর চাইলেন? এ নম্বর তো চিরকাল এনগেজড। সিদ্ধান্ত— হয় তিনিই দশ মিনিট আগে ডিসপেপ্লারিতে মোহন থাপ্পা সেজেছিলেন, অথবা অপারেটর নিজেই বাহাদুরের পার্টটুকু বলে তারপর ডাক্তার মৈত্রকে টেলিফোন করে জানিয়েছে যে, লাইন আবার ব্যবহার করা হচ্ছে, টেলিফোন রিসিভারে রাখা আছে।'

দাদু এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন। আবার প্র্যাকটিসে বার হচ্ছেন তিনি। ছুটিও ফুরিয়ে এল, হেবোরা এইবার কলকাতায় ফিরবে। যাবার দিনে দাদু ওকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেন—'ক্ষুদে গোয়েন্দা! এই ক্যামেরাটা তোমাকে দিলাম। তোমার অদ্‌ভুত সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ।'

হেবো তো আগেই আনন্দে আটখানা হয়েছিল। ক্যামেরাটা পেয়ে সে একেবারে ষোলখানা হয়ে গেল। পকেট লাইকা! এতটুকু একটা ক্যামেরা—এত ছোট যে, মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের বাঘা-বাঘা গোয়েন্দার দল যা ব্যবহার করে। দাদু বুঝি কয়েক হাজার টাকা খরচ করে সেটা আনিয়েছেন কলকাতা থেকে, তাঁর ক্ষুদে গোয়েন্দা-দাদুর জন্য!

তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ, এবার যখন ওরা কলকাতায় ফিরে এল তখন হেবোকে দেখে মনে হচ্ছিল পানিপথ থেকে সদ্য ফিরছেন সম্রাট বাবর শাহ! আর মেজদা? তার মুখখানা দেখে মনে হচ্ছিল—ইব্রাহিম লোদি দ্য সেকেণ্ড! বন্ধুমহলে হেবোর সে কী খাতির! এবারকার ঘটনাটাও সংবাদপত্রের কল্যাণে সকলে আগেই জানতে পেরেছিল।

কলকাতায় ফিরে এসে হেবো দেখে তার নামে আবার একখানা চিঠি এসেছে। খামটা না খুলেও বুঝতে পারে কোথা থেকে এসেছে সেটা। এবার নিশ্চয় উনি হেবোর কৃতিত্বে দুটো প্রশংসার কথা লিখেছেন। অধীর আগ্রহে খামটা খুলে ফেলে হেবো। আর সঙ্গে-সঙ্গে যেন ইলেকট্রিক শক খেল বেচারা! চিঠিতে লেখা ছিল।

'কল্যাণীয়েষু,

পলাশপুরের কীর্তিকাহিনী শুনলাম অজিতেন্দ্রর কাছে। তোমাকে বারবার

জানিয়েছি, অল্প বিদ্যা সম্বল করে কখনও বড় গোয়েন্দা হওয়া যায় না। ভুল হবেই। মনে হয় উপদেশে তোমার শিক্ষা হবে না। ঠেকে শিখতে হবে তোমাকে একদিন। উপায় নেই, তাই-ই তোমার ললাট-লিখন। না হলে এত বড় ছুটিতে তুমি একবারও পড়ার বইগুলো খুললে না কেন? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি অল্প আঘাতেই যেন তোমার চৈতন্য হয়। ইতি—'

আচ্ছা তোমরাই বল, এত বড় সাফল্যের পর ঐ রকম একটা প্যানপ্যানে পানসে চিঠি পেলে কেমন লাগে? হেবো উল্টো রাগ করে পড়াশুনা একেবারেই ছেড়ে দিল। না, সে পড়বে না। পোপোক্যাটিপ্যাটেল কোথায়, হিউ-এনৎসাঙ কে, আর জিরাণ্ডিয়াল ইনফিনিটিভ কাকে বলে না জানলে বড় গোয়েন্দা হওয়া যায় না? সে বিশ্বাস করে না এ কথা। ঐ তো নৃপতি, ওদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়, বইয়ের পোকা একটা। সে পারত এ রহস্যের কিনারা করতে?

পড়ার বইয়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক হেবো চুকিয়ে দিল একবারে।

তারপর হঠাৎ একদিন ওর মনে হল—উনি কেন লিখলেন, অল্প বিদ্যা সম্বল করে কখনও কোন বড় কাজ করা যায় না, ভুল হবেই। সে কি কি-ছু ভুল করেছিল? কী ভুল?ওর হঠাৎ মনে হল, তবে কি একা ডাক্তার মৈত্রের কারসাজি ছিল না সেই পলাশপুরের ভূতের খেলায়? কিন্তু আর কার স্বার্থ থাকতে পারে?

বিদ্যুৎচমকের মতো একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়। সব নষ্টের গোড়া কি তাহলে লুটুমামা? দাদুর অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তিটা আসবে লুটুমামার হাতে। তাই কি তিনি ডাক্তার মৈত্রকে দিয়ে নিজের স্বার্থে এই কাজটা করাচ্ছিলেন? ডাক্তার মৈত্রও কি প্র্যাকটিসটা হাতাবার প্রেরণার সায় দিয়েছিলেন এই ষড়যন্ত্রে? অসম্ভব নয়; অসম্ভব কেন, নিশ্চয় এটা সম্ভব। অথচ শার্লক হেবোর মতো বিচক্ষণ গোয়েন্দা আসল অপরাধীকে না ধরে ধরল তার সহকারীকে? ছি ছি ছি!

সুযোগ এল পূজার ছুটির সময়। হেবো বলে—'আবার ছুটিতে আমরা পলাশপুরেই যাই না, মা?'

মা বলেন—'সে কি রে? পলাশপুরে তো এখন ওঁরা কেউ নেই।'

'নেই? কেন? তবে দাদু কোথায় আছেন?'

'জ্যাঠামশাই শরীর সারাতে দার্জিলিঙ গেছেন।'

'লাভলি!' —লাফিয়ে ওঠে হেবো, 'তবে দার্জিলিঙেই চল না!'

অবিনাশবাবু ইতস্তত করছিলেন; কিন্তু পরদিনই ঘটনাচক্রে এল দাদুর একখানা চিঠি। লিখেছেন—'প্রিয় অবিনাশ, তোমার কলেজের তো এখন ছুটি !আমার দাদুদেরও ছুটি হয়েছে নিশ্চয়। এখানে একা-একা আমার দিন কাটে না। উঁচু-নিচু জায়গায় বেশি হাঁটতেও পারি না। লুটু তো দিবারাত্র শুধু ছবি এঁকে বেড়াচ্ছে। তার দেখাই পাই না। তোমরা সকলে ছুটিটা

এখানে কাটিয়ে গেলে খুশি হতাম।'

মেজদা বলে—'কিন্তু ঐখানটা তো বুঝলাম না মা! লুটুমামা ছবি এঁকে বেড়াচ্ছে মানে?'

হেবো বলে—'বাঃ, ভুলে গেছিস? লুটুবাবু আর্টিস্ট নয়? ছবি আঁকা আর মডেল গড়া হচ্ছে তাঁর নেশা! অন্তত ভেকটা তাই ধরেছেন তিনি।'

মা বলেন—'ও আবার কি ধরনের কথা! লুটু সত্যিই ভাল ছবি আঁকে।'

হেবো উদাস কণ্ঠে বললে—'দুঃখ এই যে, চক্ষুকর্ণের বিবাদটা এখনও ঘোচেনি। স্বচক্ষে তাঁর কোন শিল্পকার্য দেখিনি তো সেবার।'

'বাঃ! তখন ঐ অসুখের বাড়িতে—'

মেজদা বাধা দিয়ে বলে—'আচ্ছা লুটুমামা দাদুর কোন সম্পর্কের ভাগ্নে?'

মা বলেন, 'ঠিক জানি না। শুনেছি সম্পর্ক কি একটা যেন আছে।'

হেবো মনে মনে বলে—'তা তো আছেই! যম-জামাইয়ের সম্পর্ক!'

শেষ পর্যন্ত কিন্তু অবিনাশবাবু ও হেবোর মায়ের যাওয়া হল না। হেবোর কাকিমার শরীর খারাপ। তাই ওঁরা রয়ে গেলেন। অবিনাশবাবু বলেন—'তবে জ্যাঠামশাই অত করে লিখেছেন—ছেলেরা বরং যাক।'

আপত্তি করল মেজদা, বলে—'ওকে নিয়ে যেতে আমার সাহস হয় না! হয় আমি যাই, হেবো থাকুক, অথবা—'

বাধা দিয়ে মা বলেন—'না না, হেবো এবার কোন গণ্ডগোলের মধ্যে থাকবে না।'

বার বার করে তিনি সাবধান করে দিলেন হেবোকে। হেবো স্পিকটি নট।

দার্জিলিঙে হেবো যে কাণ্ডটা করেছিল সেই গল্পটা দিয়ে শেষ করব এ কাহিনী। কিন্তু ঘটনাটা আমি নিজের ভাষায় বলব না। ওর ডায়েরির খানকতক পাতা তুলে দেব শুধু। তা থেকেই ঘটনাটা জানতে পারবে তোমরা।

১৭ই সেপ্‌টেম্বর

ঘুম।

কাল মাত্র দার্জিলিঙে এসে পৌঁছেছি। আমার জীবনে এই প্রথম শৈলনগরী দার্জিলিঙ ভ্রমণ। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা বর্ণনা করবার জিনিস বটে; কিন্তু আমার ডায়েরি লেখার উদ্দেশ্য তা নয়। তাই ডায়েরি-পাঠকের কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমাকে এই ডায়েরি লিখতে হচ্ছে এজন্যে যে, আমার জীবনে ডাক্তার ওয়াটসনের সাক্ষাৎ আমি এখনও পাইনি। তিনি আবির্ভূত হলেই আমার ছুটি।

দার্জিলিঙ এসেছি আমি আর মেজদা, উঠেছি দাদুর বাড়িতে। আমার দাদু রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক জীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। কয়েক মাস আগে ভূতের ভয়ে তিনি স্নায়বিক দুর্বল্যে (কথাটা 'দৌর্বল্যে', হেবো বানানটা ভুল করেছে) ভুগছিলেন। আত্মশ্লাঘা করব না, কোন

একজন কিশোর গোয়েন্দার বুদ্ধির জোরে তিনি সে রোগ থেকে মুক্ত হয়েছেন; কিন্তু এখনও একেবারে স্বাভাবিক হতে পারেননি। অল্পেতেই তিনি উদ্বিঘ্ন (অর্থাৎ 'উদ্বিগ্ন' —এত বানান ভুল করলে হেবো হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করবে কেমন করে?) হয়ে পড়েন। মৃত্যুভয়টা যেন তাঁকে পেয়ে বসেছে!

বাড়িটা ঠিক দার্জিলিঙে নয়—দার্জিলিঙের মাইল-কয়েক আগে— বাতাসিয়া ডবল লুপের কাছে, ঘুমে। মস্ত বাড়ি! দাদুর সঙ্গে আছেন ভাগ্নে প্রবর, অর্থাৎ আমাদের লুটুমামা। আর আছে কিশোর থাপা, মোহন থাপার ছোট ভাই। সব নেপালীর মত চোখ দুটি কুৎকুতে, মাথায় খাটো, আর তার ডাকনাম—সব নেপালীর মত, বাহাদুর। নটবর দাদুর পলাশপুরের বাড়ির তদারক করছে।

আগেই বলেছি, এখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য, আসবার পথের বর্ণনা লিখে ভ্রমণ কাহিনীর পাতা ভরানো চলে—কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক গোয়েন্দার ডায়েরিতে সে সব বাহুল্য। আমি এখানে এসেছি একটা বিরাট রহস্যার কিনারা করতে—তার প্রথম পর্ব খতম করে এসেছি পলাশপুরে। শুনেছি ডাক্তার মৈত্র এখন ডোরাকাটা হাফ-প্যান্ট পরে, গলায় নম্বরি তক্তি ঝুলিয়ে কপি বুনছেন। এবার নাটের গুরুকে গেঁথে তুলতে পারলেই নিশ্চিন্ত। সেই মহাপ্রভুর সন্ধানেই আমার এ অভিযান।

১৮ই সেপ্‌টেম্বর

ঘুম।

লুটুমামাকে যেন চেনাই যায় না! পলাশপুরের সেই ভদ্রলোকটিকে এই লুটুমামার মধ্যে যেন খুঁজেই পাওয়া যায় না। এখন উনি পুরোপুরি আর্টিস্টের ভেক ধরেছেন। আঁকবার সরঞ্জাম নিয়ে রোজই ভোরবেলা উনি বেরিয়ে যান, ফেরেন একেবারে সন্ধ্যা করে। কোন পাহাড়ের ধারে, কোন গাঁয়ের কিনারে, কোন ঝরনার পাশে বসে তিনি ছবি আঁকবেন তা বলে যেতেন শুধু বাহাদুরকে। রোজ দুপুরবেলা বিরাট টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার, ফ্লাস্কে করে কফি নিয়ে সে খাইয়ে আসে তাঁকে। আমি একদিন ওঁর সঙ্গে ছবি আঁকা দেখতে যেতে চাইলাম—কিন্তু ধমক শুনতে হল পরিবর্তে। আশ্চর্য! ভদ্রলোক যে কী আঁকেন তাও দেখাতে চান না! সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে নিজের ঘরে কাগজমোড়া ক্যানভাসটা রেখে, ঘর তালাবন্ধ করে আবার বেরিয়ে যান। ফেরেন গভীর রাত্রে। লুটুবাবুর চলা-ফেরা রীতিমত সন্দেহজনক। উনি আদৌ ছবি আঁকেন কি? দাদুকে একদিন কথার ছলে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি লুটুবাবুর আঁকা কোন ছবি কখনও দেখেছেন কি না।

দাদু হেসে বলেন—'আবার ওর পিছনে লেগেছ? কেন বাপু? তোমরা খাও-দাও ফূর্তি কর। ওকে নিজের মত থাকতে দাও।'

আমি মনে মনে হাসি। তা দিলে আমার চলে কেমন করে? দুনিয়ার তাবৎ সন্দেহভাজন

ব্যক্তিকে যদি যার-যার নিজের মতো থাকতে দেওয়া যায়, তাহলে শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর দশা কী হবে? আর আশ্চর্য মানুষ ঐ বাহাদুর! সত্যি রক্তমাংসের মানুষ তো ও? ওকে প্রশ্ন করে কোন জবাব পাওয়ার উপায় নেই। কী ট্রেনিংই দিয়ে রেখেছেন ওকে লুটুমামা! লোকটা যেন কথা বলতেই জানে না। লুটুমামা কিসের ছবি আঁকেন জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দেয় না। শুধু মিটি-মিটি হাসে। খুদে চোখদুটো একেবারে বুজে যায়।

আমার আরও সন্দেহ হয়, বাহাদুরও ষড়যন্ত্রের ভিতর নেই তো! লুটুমামার সহকারী নয় তো সে কোনও পাপের কারবারে?

মেজদাকে একদিন এ সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। এমন মাথামোটা গবেট ওটা, বলে—'নড়েছে?'

অবাক হয়ে বলি—'নড়েছে মানে? কী?'

'পোকা!'

আরও অবাক হয়ে বলি—'পোকা? কোথায় নড়েছে?'

বলে—'তোমার মগজে!'

ওর সঙ্গে পরামর্শ করা বৃথা। যার মগজে নিরেট গোবর সে কেন যায় পরের মগজের খবর নিতে।

২৫শে সেপ্‌টেম্বর।

কদিন আর ডায়েরি লিখিনি। কারণ নূতন কোন ক্লুর সন্ধান পাইনি এখনও। একটা জিনিস অবশ্য লক্ষ্য করছি—লুটুমামা এ কয়দিন আর আঁকতে বার হচ্ছেন না। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটিয়ে দিচ্ছেন নিজের ঘরে, দরজা বন্ধ করে। একেবারে নির্জন নয় কিন্তু। বাহাদুরও থাকছে ঘরে। ব্যাপারটা রীতিমত রহস্যজনক। বন্ধ ঘরে কী করছেন ওঁরা দুজনে? মেজদাকে দ্বিতীয়বার বলতে গেলাম কথাটা। মেজদা ধমকে উঠল—'দ্যাখ হেবো! এইজন্যই তোর সঙ্গে আসতে চাইনি। তোর সঙ্গে এখানে একসঙ্গে থাকা আমার পোষাবে না; হয় আমি থাকি তুই ফিরে যা না হয় আমিই থেকে যাই তুই বিদেয় হ!

মাথামোটা গবেট কোথাকার! এত বড় সোজা কথাটা খেয়াল হচ্ছে না গবেটটার? এর মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেল না? সে খেয়াল করে দেখল না যে, লুটুমামা একজন শিক্ষিত বাঙালী যুবক, ওদিকে বাহাদুর ভাল করে বাঙলা কথাই বলতে পারে না। দু-জনের শিক্ষায় দীক্ষায় আশমান জমিন ফারক! তাহলে এমন কী বিষয়বস্তু থাকতে পারে যা নিয়ে ওঁরা দু-দিন ধরে রুদ্ধদ্বার-কক্ষে আলোচনা করছেন? একে যদি গোপন ষড়যন্ত্র না বলে তবে কাকে বলে?

আজ বিকালে আর সন্দেহ চেপে রাখতে পারলাম না। লুটুমামার ঘরের পিছন দিকের জানলাটা মাটি থেকে ফুট-আষ্টেক উঁচুতে, যদিও একতলায় ঘর। পাহাড়ে জায়গায় এ

রকম হয়েই থাকে। জানলা দিয়ে দেখতে হলে আট ফুট উঁচু একটা মই চাই। কিন্তু পাব কোথায়! বাধ্য হয়ে দু-খানা ছোট হাত-আয়না কিনতে হল। দু-খানা কঞ্চির দু-প্রান্তে আয়নাদুটো লাগিয়ে একটা পেরিস্কোপ বানিয়ে ফেললাম। কিন্তু এত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল আমার। পেরিস্কোপটা উঁচু করে ধরতেই হঠাৎ জানলা থেকে বেরিয়ে এল লুটুমামার একখানা হাত। পেরিস্কোপটা টেনে নিল সেই হাত, ঘরের ভিতর। পরমুহূর্তেই জানলার পরদাটা সরে গেল।

এবং তার পরই লুটুমামা নেমে এলেন নিচে। বলেন—'তোমাকে বলেছি না, আমার পিছনে লেগো না?'

আমি কোন কথা বলি না।

দাদুর কাছেও কথাটা বলেছেন উনি। দেখলাম, দাদুও বিরক্ত হয়েছেন। তবে নাকি আমি ওঁর প্রাণদাতা, তাই মৃদু ধমক দিয়ে শুধু বললেন—'লুটুর পিছনে লেগো না। আগেই তোমাকে একবার বারণ করেছি, ও আর্টিস্ট মানুষ, লোকজন পছন্দ করে না।'

আমি নিরীহের মত বলি—'আমি তো ওঁকে বিরক্ত করিনি!'

'শুনলাম আয়না দিয়ে কি সব যন্ত্র তৈরি করেছ?'

আমি চুপ করে থাকি।

দাদু বিরক্ত হয়ে বলেন—'এত বড় বাড়ি, খেলবার জায়গার অভাব তো নেই। ওর কাজের খবরদারি না-ই বা করলে।'

রাত্রে দেখি, মেজদা মস্ত চিঠি লিখছে। এদিকে মাথা-ভরা গোবর, ওদিকে চুকলি কাটার যম!

৩রা অক্টোবর।

ভগবান এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। না হলে মূক বাহাদুর কী করে এমন মুখর হয়ে ওঠে? কাল বিকালে লুটুমামা বেরিয়ে যাবার পর বাহাদুর আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। বাতাসিয়া ডবল লুপের দিকে বেড়াতে গেলাম আমরা। নির্জনে এসে বাহাদুর আমাকে খুলে বললে তার সমস্যার কথা। ভাঙা-ভাঙা হিন্দির মধ্য থেকে যে কাহিনীটা উদ্ধার করলাম, তা এই :

বাহাদুরের বাড়ি এই দার্জিলিঙ পাহাড়েই। গয়াবাড়ি টী এস্টেটে। উত্তরাধিকার সূত্রে সে একটা পাথরের মূর্তি পেয়েছে। কোন তিব্বতী লামার কাছ থেকে ওর ঠাকুর্দা এনেছিলেন বুঝি। বাহাদুর সেটাকে নিত্য পুজো করে। লুটুমামার নজর পড়েছে ঐ মূর্তিটার উপর। তিনি বাহাদুরকে পীড়াপীড়ি করছেন মূর্তিটা তাঁকে বিক্রি করে দিতে। প্রথমে নগদ পাঁচ টাকা দর দিয়েছিলেন—বাহাদুর আপত্তি করায় দরটা বাড়িয়ে দশ-বিশ পচিশ করতে করতে নগদ একশো টাকা পর্যন্ত উঠেছে! অথচ বাহাদুরের ইচ্ছে নয় দেবমূর্তিকে সে বিকয় করে। ওকে

গররাজি দেখে লুটুমামা আজ ওকে বলেছেন নগদ দুশো টাকা দেবেন তিনি। বাহাদুর ইতস্তত করছে এখন। দুশো টাকা কম নয়। অথচ ঠাকুর্দার আমল থেকে ওদের বংশে মূর্তিটার পুজো হচ্ছে। দেবতাকে বিক্রয় করতেও মন উঠছে না। আজ বাহাদুরের আবার ভয় হয়েছে— লুটুমামা ঐ মূর্তিটা পাওয়ার জন্য যেভাবে ক্ষেপে উঠেছেন, তাতে মনে হয়, সোজাপথে ওটা নাপেলে বাঁকা পথের আশ্রয় নিতেও তিনি পিছপাও হবেন না।

বুঝতে পরি, যে-কোন কারণেই হোক মূর্তিটা অত্যন্ত মূল্যবান। কী হতে পারে? মূর্তিটা দেখতে চাইলাম। বাহাদুর আমাকে নিয়ে গেল তার ঘরে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কনকনে শীত পড়েছে। ওর ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা প্রদীপ জ্বালায় বাহাদুর। আউট-হাউসে ইলেকট্রিক কানেকশন নেই। প্রদীপের আলোয় ঘরখানা ভাল করে দেখি। ছোট ঘর— একদিকে বাহাদুরের বিছানা পাতা, চৌকির উপর। চৌকির নিচে আছে কালো রঙের একটা ট্রাঙ্ক। অপর পাশে একটা বাক্স-মতো কিছু কাপড় দিয়ে ঢাকা। সামনে একটা কাঠের বেদীর উপর বসানো আছে বাহাদুরের দেবমূর্তি। ফুটখানেক উঁচু। শ্বেত পাথর খুদে বানানো। একটা রাক্ষস যেন হা হা করে হাসছে। এ আবার কেমন দেবমূর্তি? যাই হোক মূর্তিটার চোখদুটো দেখবার মতো। প্রদীপের আলোয় চোখদুটো জ্বলে উঠল। কী দিয়ে তৈরী চোখদুটো? হীরে নয় তো? না হলে এই সামান্য পাথরের মূর্তিটার জন্য এত দাম দিতে চাইছেন কেন লুটুমামা? পাথরের মূর্তিটা ফাঁপা নয় তো? ওর ভিতরে কোন নবাবজাদার হারানো কমলমণি হীরে অথবা কোন মহারানীর নেকলেস লুকানো আছে কি? তিব্বতী লামাদের নিয়ে অনেক রহস্যজনক গল্প পড়া আছে। তিব্বতী লামা যে গল্পে ঢুকবে সেই গল্পেই রহস্যজনক একটা কিছুর সন্ধান পাওয়া যাবে। এখানেও নিশ্চয়ই তেমন কিছু আছে।

বাহাদুরকে অত কথা কিছু বললাম না। তাকে শুধু বলি যে, কোন দামেই যেন সে দেবমূর্তিটা বিক্রয় না করে। তাহলে দেবতার রোষ পড়বে তার উপর। বাহাদুর বোধহয় আমার কথা বুঝতে পারে। ঘাড়টা নাড়ে বার-দুই। আধবোজা চোখদুটো একেবারে বন্ধ করে কি যেন মন্ত্রপাঠ শুরু করে।

ওর ঘর থেকে বেরিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল আমাকে। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন লুটুমামা। তাঁর চোখদুটো জ্বলছে ঐ মূর্তিটার মতই। আমাকে দেখে বলেন—'আবার বাহাদুরের পিছনে লেগেছ?'

আমি বলি—'আমি তো দেখছি আপনিই আমার পিছনে লেগেছেন।'

'বটে! তা এখানে কী মনে করে?'

আমি গম্ভীরভাবে বলি—'বাহাদুর ঐ মূর্তিটা বিক্রি করবে শুনেছিলাম —তাই দেখতে এসেছি।'

'তুমি কিনবে বুঝি? কত দাম জান ওটার?'

'জানি, এবং এ-ও জানি আপনি যা আন্দাজ করছেন তার চেয়ে বেশি।'

একটু থতমত খেয়ে যান লুটুমামা। বলেন—'কত দাম বল তো?'

'আমি বাহাদুরকে তিনশো টাকা দাম দিয়েছি।'

একেবারে হকচকিয়ে যান লুটুমামা। আমতা আমতা করে বলেন—'অত টাকা তোমার কাছে আছে?'

আমি একটা মোক্ষম চাল চালি। বলি—'না নেই, তবে আমার জানা খদ্দের আছে, যে ওর চেয়েও বেশি দামে আমার কাছ থেকে ওটা কিনে নেবে।'

অনেকক্ষণ লুটুমামা কোন জবাব দিলেন না। তারপর গুটি-গুটি দাদুর ঘরের দিকে চলে গেলেন।

রাত্রে মেজদা আমাকে ডেকে বললে—'আর তো পারি না তোর জ্বালায় হেবো! আবার গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছিস তুই? দ্যাখ, এভাবে আমার পোষাবে না, হয় আমি থাকি তুই চলে যা—'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলি—'অথবা তুমি থাক আমি চলে যাই, কেমন না? কিছু ভাবতে হবে না মেজদা, তুমি আমি দু-জনেই থাকব। যেতে হয়, যাবে ঐ কংসমামাই?'

৫ই অক্টোবর।

আজ সকাল থেকে দেখি লুটুমামার ঘর তালাবন্ধ। কোথায় গেছেন তিনি? আমার চোখ এড়িয়ে কিছু হবার জো নেই। একটু সন্ধান নিতেই বুঝতে পারলাম লুটুমামা গিয়ে প্রবেশ করেছেন আউট-হাউসের ঐ খাপরার ঘরখানায়। সকাল তখন আটটা। সমস্ত সকালটা নজরে নজরে রেখেছি তাঁকে। কী আশ্চর্য, উনি যখন আউট-হাউসের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তখন সকাল সাড়ে এগারোটা। সাড়ে তিনঘণ্টা ধরে ঐ খাপরার ঘরে দু-জনে মিলে কিসের পরামর্শ করছিলেন, লুটুমামা আর বাহাদুর? ওঁর ঘরে কেন যে পরামর্শ-সভাটা আর বসছে না তা উনিও জানেন, আমিও জানি। কাল বিকালে উনি দেখতে পেয়েছিলেন আমাকে।

পেরিস্কোপের পরীক্ষায় ব্যর্থ হবার পর আমি নিশ্চিন্ত থাকিনি। কাল বিকালে লক্ষ্য করে দেখলাম, পিছনের পাহাড়ে একটি স্থান আছে যেখানে যেতে পারলে ঐ ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে ঘরটা দেখা যাবে। কিন্তু দূরত্বটা বড় বেশি। অন্তত পাঁচশো ফুট তো বটেই। অত দূর থেকে ঘরের ভিতর কি হচ্ছে দেখা যাবে না। তাই 'গুরুবিদায়'-কেসে পাওয়া বাইনোকুলারটা নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে করে। অনেক কায়দা করে হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে জায়গাটায় পৌঁছে যেই বাইনোকুলার দিয়ে তাক করতে যাব অমনি জানলার পর্দাটা কে যেন টেনে দিল। উনিও কি ঘর থেকে বাইনোকুলার নিয়ে জানলা থেকে লক্ষ্য করছিলেন আমার পর্বতারোহণ?

তা সে যাই হোক দুপুরবেলা বাহাদুর এসে আমাকে চুপি-চুপি খবর দিয়ে গেল লুটুবাবু আজ সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা যাচ্ছেন। ভদ্রলোক সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন যে, শার্লক হেবোর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে বেশি কিছু কায়দা করা যাবে না। সারাটা দুপুর ধরে মামাবাবু বাঁধাছাঁদা করলেন, আমি ভালমানুষের মত আড়চোখে শুধু দেখেই গেলাম। কী হতে পারে? যদিও বুঝছি গভীর একটা ষড়যন্ত্র চলেছে অন্তরালে—তবু ষড়যন্ত্রটা কী জাতীয় যতক্ষণ না বোঝা যাচ্ছে ততক্ষণ প্রতিষেধক প্রয়োগ করি কেমন করে?

লুটুমামা আদৌ ছবি আঁকেন না এটা বুঝতে পেরেছি। এ সত্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কী প্রমাণ? বলছি। লেখকরা লিখে থাকেন, গায়করা গান শেখেন, চিত্রকররা ছবি আঁকেন, অভিনেতারা পার্ট মুখস্থ করেন। কেন? লেখা, গান শেখা, ছবি আঁকা বা পার্ট মুখস্থ করা তখনই সার্থক হয়ে ওঠে যখন লেখক-গায়ক-চিত্রকর-অভিনেতারা সাক্ষাৎ পান সমঝদারের। লেখকের চাই পাঠক, গায়কের শ্রোতা, চিত্রকরের দর্শক এবং অভিনেতার হাউস-ফুল বিজ্ঞপ্তির। লুটুমামা কিন্তু ব্যতিক্রম। তিনি ছবি আঁকেন, কিন্তু কাউকে দেখতে দেবেন না। পাছে আমরা দেখে ফেলি, পাছে আমরা ভাল বলি, প্রশংসা করি। বুঝেছি মশাই, এ আপনার স্রেফ ধাপ্পাবাজি!

তবে কেন অমন ঢং ধরেছেন? রঙ-তুলি-ইজেলের বোঝা নিয়ে কেন এত ভণ্ডামি? তাও জানি। যে পাপ কাজে তিনি হাত দিয়েছেন, তাতে পাহাড়ে পর্বতে সারাদিন ওঁকে টো-টো করে ঘুরতে হয়। তার জন্য একটা ভড়ং চাই। কী? না—আমি আর্টিস্ট; আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই এভাবে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার। তোমরা রোজ-রোজ আমাকে এমনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে মনে কোনও সন্দেহ পোষণ কোরো না। কারণ আমি আর্টিস্ট। আমি ছবি আঁকবার জন্যই এ কৃচ্ছ্রসাধন করছি। এটা বোঝা সহজ। তাহলে বাহাদুর সে কথা প্রকাশ করে দেয় না কেন? এর একটিমাত্র জবাব হতে পারে, বাহাদুরও ঐ পাপ কাজের ভাগীদার। না হলে ঐ নিরক্ষর নেপালীটার সঙ্গে অর্গলবদ্ধ ঘরে তিনি তিনদিন ধরে কিসের কনফারেন্স করলেন? কিন্তু বাহাদুর যদি মামার সাকরেদিই করবে তবে সে মূর্তিটার কথা আমাকে বলে দিল কেন? এরও একটা সম্ভাব্য জবাব আছে। চোরে চোরে যখন মাসতুতো ভাই, ততক্ষণ নেক-এ নেক-এ ন্যাকামি! আবার চোর যখন চোরের উপর বাটপাড়ি করে তখন সহযোগী চোরের নেক-এ ছুরি চালাতেও দ্বিধা করে না! এইভাবেই লুটুমামা ডাক্তার মৈত্রকে ফাঁসিয়েছিলেন এবং ডাক্তার মৈত্রও লুটুমামাকে ফাঁসাতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পৃথিবীতে যত বড়-বড় ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে, তাদের মূলেও এই একই কথা।

বাহাদুরকে ডেকে সাবধান করে দিলাম। বললাম, অন্তত আজকের দিনটা সে যেন ঐ রাক্ষস মূর্তিটা সামলে সামলে রাখে। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশদা একবার একটা মূর্তির ভিতর থেকেই কমল হীরে আবিষ্কার করেছিলেন; হিচককের 'নর্থ বাই নর্থ -ওয়েস্ট'-এও দেখা

গেছে মূর্তির ভিতর লুকিয়ে গোপন খবরের 'টেপ' পাচার করা যায়। শার্লক হোমসের একটি গল্পে পাথরের মূর্তির ভিতর থেকে রহস্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও নিশ্চয় এই ধরনের কিছু হচ্ছে। না হলে এই সামান্য মূর্তিটার জন্য লুটুমামা চারশো টাকা দর দেবেন কেন? ওহো, বলতে ভুলে গেছি, আমি তিনশো টাকা দর দেবার পর মামাবাবু নিলামের দর আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। পুরোপুরি চারশো টাকাই দেবেন তিনি। শুরু করেছিলেন পাঁচ টাকা থেকে। বাহাদুরেরও কেমন যেন রোখ চেপে গেছে। সে কিছুতেই বিক্রয় করবে না মূর্তিটা। না, চারশো টাকা পেলেও নয়!

বাহাদুরকে বলি, মূর্তিটা যেন আজকে সামলে সামলে রাখে। কারণ আজ অতর্কিতে ওটা চুরি যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। দেখলাম বাহাদুরও সেটা আশঙ্কা করেছে। ওর খুদে-খুদে চোখদুটো আরও ছোট হয়ে গেল। বলে—'চুরি যানে সে—হুঁ!' হাত দিয়ে নিজের

গলার কাছে জবাই করার আড়াই-পোঁচি ভান করে। কী সর্বনাশ! শেষকালে খুনোখুনি কাণ্ড হবে নাকি একটা? বিচিত্র নয়! লুটুমামা যদি ওটা অন্যায়ভাবে নিয়ে সরে পড়তে চান তবে বাহাদুরের ভোজালিটাও হঠাৎ রক্ত-পিপাসু হয়ে উঠতে পারে!

কিন্তু সারাদিন যাবার উদ্যোগই করলেন লুটুমামা—গেলেন না। সন্ধ্যাবেলায় দেখি দাদুকে বলছেন—'একটা কাজ বাকি আছে। আজ রাতে সেটা সেরে কাল ভোরের গাড়িতে

যাব আমি।'

আমি মনে-মনে হাসি। মনে-মনেই বলি—'হে সম্রাট কংসমামা! জানি, আপনার কোন মহৎ কর্মটি অসমাপ্ত আছে। বাহাদুরের হীরকখচিত মূর্তিটির অপহরণ-পর্ব! কিন্তু আপনি তো জানেন না শ্রীমান শার্লক হেবোর সতর্ক দৃষ্টি গোকুলে বাড়ছে! শার্লক হেবো থাকতে ওটা অপহৃত হবে না! হতে পারে না!'

তৎক্ষণাৎ খবরটা বাহাদুরকে দিলাম। ওকে খুব সাবধানে থাকতে বললাম আজকের রাত্রিটা।

* * *

মজার কথা এই যে, হেবোর ডায়েরিতে এর পর মাস দুই-তিন আর কিছু লেখা নেই। আমি তো অবাক! এমন একটা মারাত্মক জায়গায় এসে হঠাৎ ডায়েরি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিল কেন সে? আমার ভীষণ কৌতূহল হয়েছিল। তোমাদেরও হচ্ছে নিশ্চয়--নয়? শেষ পর্যন্ত ওর মেজদার কাছ থেকে বাকি অংশটা আমি উদ্ধার করেছিলাম :

হেবো লক্ষ্য করল যে লুটুমামা প্রতিদিনের মত সেদিন আর সন্ধ্যায় কোথাও বার হলেন না। সকাল-সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে দরজায় খিল দিলেন। হেবো সতর্ক হয়ে জেগে রইল। 'ঘুম'-এর কনকনে হাড়-কাঁপানো শীত। 'ঘুম'-এর দেশের ঘুম ওর চোখে জড়িয়ে ধরছে। হেবো প্রতিজ্ঞা করেছিল এই কালরাত্রে সে কিছুতেই ঘুমোবে না। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন ওকে বলে দিচ্ছিল যে শেষ রাত্রে লুটুমামা ঐ রাক্ষস মূর্তিটা অপহরণ করে ভোরের গাড়িতে কলকাতা পালাবেন।

. . . মেজদা পাশেই লেপ মুড়ি দিয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। কী মজা ওদের! দুনিয়ার যত ঠগ বদমায়েশ তোমাদের আশেপাশে সর্বনাশের জাল পাতে, আর তোমরা মোষের মত ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমাও! আর সর্বনাশ যখন হয়ে যায় তখন সকালবেলা কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে হাঁউমাউ করে কাঁদতে বসো!

এইসব ভাবতে ভাবতে কখন নিদ্রাদেবী এসে হেবোর চোখে পরিয়ে দিলেন ঘুমের কাজল। হঠাৎ ভোর রাতে কিসের আওয়াজে ওর ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে শুনলে মেজদার নাক ডাকছে 'ফৎ, ফৎ, ফত্যুর্‌র্‌র্‌!'

ধক্ করে উঠল হেবোর বুকের মধ্যে—ওদিকেও কি সব ফতুর হয়ে গেল নাকি? লাফ দিয়ে উঠে পড়ে হেবো। রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটায় (যেটা সে আফিং-চোর ধরে প্রাইজ পেয়েছিল) দেখে, ভোর পাঁচটা। অর্থাৎ সকাল হয়ে এল প্রায়। আলনা থেকে সোয়েটার, ওভারকোট, মোজা, মাফলার, একে-একে গায়ে চড়ালো। তারপর পা টিপে-টিপে বার হয়ে এল ঘর থেকে। মেজদা তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ক্যালকাটা রোডের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্যাক্সি। পাশেই লুটুবাবুর ঘর। আশ্চর্য! তার দরজা খোলা। অথচ ঘর অন্ধকার। হেবো দরজা ঠেলতেই খুলে গেল সেটা। বা হাতের টর্চটা জ্বালতে লক্ষ্য করল সুটকেস

বিছানা সব একপাশে গোছানো আছে—অথচ লুটুবাবু নেই। টর্চ নিবিয়ে হেবো বেরিয়ে আসে বাগানে। দ্রুত পদে বাগানটা পার হয়ে এসে পৌঁছয় বাহাদুরের ঘরে। দরজা বন্ধ। পিছন দিকে গিয়ে দেখে একটা জানলা খোলা আছে। চমকে ওঠে হেবো। এই শীতে কেউ জানলা খুলে শোয়? জানলা দিয়ে ভিতরে একবার উঁকি মেরে দেখতে পারলে হত! মূর্তিটা যেখানে থাকে সেটা জানলার ভিতর দিয়ে দেখতে পাওয়া উচিত। হেবো একবার স্বচক্ষে দেখে নিশ্চিন্ত হতে চায়। কিন্তু জানলাটা বেশ উঁচুতে। হেবো নাগাল পেল না। পেরিস্কোপটা বেহাত হয়ে গেছে—না হলে এ সময়ে সেটা কাজে দিত। তবে উদ্যোগী পুরুষসিংহের অসাধ্য কাজ নেই। হেবো উঠে পড়ল পাশের কমলালেবু গাছটায়। গাছের নিচের দিকেই একটা ডাল বার হয়েছে। তার উপর উঠে হেবো উঁকি দিল ঘরের মধ্যে। ভিতরে সূচীভেদ্য অন্ধকার। হেবো টর্চটা জ্বেলে ঘরের ভিতর আলো ফেলল —ঠিক যেখানে মূর্তিটা রাখা ছিল!

হঠাৎ এক ঝলক আলোয় হেবো যা দেখল তাতে তার সমস্ত শরীরটা একবার থরথর করে কেঁপে ওঠে। হাত থেকে প্রথমেই টর্চটা গেল পড়ে। তারপর ঠক্-ঠক্-করা হাঁটুদুটো আর হেবোর দেহভার রাখতে পারল না। মাথা ঘুরে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিচে।

হেবোর দোষ নেই। ও তো ছেলেমানুষ, বড়রা কেউ ও দৃশ্য দেখলেও অজ্ঞান হয়ে যেতেন। একঝলক আলোতেই সে স্পষ্ট দেখে নিয়েছিল —বেদীর উপর মূর্তিটা নেই। তার বদলে ঠিক সেই জায়গায় একটা পেতলের থালায় রাখা আছে বাহাদুরের ছিন্ন মুণ্ড।

একনজর মাত্র দেখেছে সে, কিন্তু ভুল হেবোর হয়নি। হতে পারে না। আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ নিয়ে হেবো সনাক্ত করতে পারে যে মুণ্ডটা গয়াবাড়ি টী এস্টেটের কিশোর থাপার। সেই চ্যাপটা নাক, খুদে খুদে চোখ, ভ্রূর উপর কাটা দাগ, মাথায় তখনও সেই তার টিপিক্যাল টুপিটা, আর গলার নিচে ধড় নেই। ঘরের ও প্রান্তে খাটানো মশারির তলা থেকে বাহাদুরের একখানা ঠ্যাঙ বেরিয়ে ছিল। অর্থাৎ ধড়টা চাপা দেওয়া আছে মশারির তলায়। ধড় থেকে মুণ্ডুর দূরত্ব—তা অন্তত দশ ফুট।

মিনিট-দুয়েক সময় লাগল উঠে দাঁড়াতে। কিন্তু না, সে ভয় পায়নি! জন্ম-ডিটেকটিভ সে, বাঙলার ভবিষ্যৎ শার্লক হোমস! ভয় পেলে চলবে কেন? তবে ওর জীবনে এটাই প্রথম ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার কেস তো! কাটা লাশ এর আগে দেখা ছিল না বলেই হাঁটু দুটো ঐ একটু ইয়ে-মতো হয়ে গিয়েছিল, ভয় পায় নি। হেবো মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেলে। এবার আর জেল নয়, অপরাধীকে ধরতে পারলে তাকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে হবে। ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার কেস! হত্যাকারী এখনও বাড়িতে আছে। চকিতের মধ্যে মনে হল, বাড়িতে শক্তসমর্থ লোক কেউ নেই। দাদু বৃদ্ধ, সে ছেলেমানুষ, মেজদাটা ক্যাবলা আর বাহাদুরের ধড়-মুণ্ডুর মধ্যে দশ ফুটের ফারাক! সুতরাং হত্যাকারী ভাগ্যেপ্রবরকে বল প্রয়োগে ধরা যাবে না। না যাক। বল তুচ্ছ, বুদ্ধিই বড়! শার্লক হেবোর বুদ্ধি খুলে গেল চট করে। সবার আগে ঐ ট্যাক্সিটাকে কায়দা করে সরাতে হবে। ওটার সাহায্য না পেলে আততায়ী বেশি দূরে যেতে পারবে না।

ওটা ক্যালকাটা রোডে দাঁড়িয়ে আছে—নিশ্চয় লুটুবাবুর অপেক্ষায়।

সদর দরজা খুলে পাহাড়ি ছাগলের মত লাফাতে লাফাতে হেবো নেমে এল পিচমোড়া কার্ট রোডে। ওদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় তখন প্রথম আবিরের প্রলেপ লেগেছে। লাগুক, হেবোর সে সব নজরে পড়ে না। ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলে—'আমাকে এক্ষুণি ঘুম স্টেশনে নিয়ে চল—'

ড্রাইভার বলে—'লোকিন উ বাবুকা ক্যা হুয়া?' লাটুবাবু?'

'হাঁ হাঁ, ঐ লাটুবাবুই তো আমাকে পাঠালেন; বললেন—'ঘুম স্টেশন থেকে একগাছা লেত্তি নিয়ে আয়। গলায় জড়াবো।'

'লেত্তি কৌন সি চীজ? কম্পাটার হ্যায় কা?'

'না সর্দারজী! সে মোম দিয়ে পাকানো মোক্ষম জিনিস! তোমাকে অত ভাবতে হবে না। আমাকে স্টেশনে নিয়ে চল দিকিনি!'

ড্রাইভার ওকে ঐ বাড়ির দরজা খুলে নেমে আসতে দেখেছিল। তাই আর আপত্তি করে না। ঘুম স্টেশনে হেবো আবিষ্কার করল দু-জন পুলিস কনস্টেবলকে। হেবো তাদের সব কথা খুলে বলল সংক্ষেপে। যদিও প্লাটফর্মেই ওদের ডিউটি ছিল, তবু মানুষ খুন হয়েছে শুনে ওরা দু-জনেই ওর সঙ্গে আসতে রাজি হল। ওদের মধ্যে একজন আবার কিশোর থাপাকে চেনে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হেবোরা ফিরে এল অকুস্থলে। হেবোর নির্দেশমত সেই কনস্টেবলটা উঠল কমলাগাছের উপর। হেবো ঘরের মধ্যে পাঁচ সেলের টর্চের আলো ফেলতেই ধপ করে পড়ে গেল পুলিসটা। তার মুখে তখন শুধু—'রাম-রাম-রাম!'

হেবো ধমক দিয়ে ওঠে—'রাম নাম পরে জপ কোরো। কাটামুণ্ডু দেখছ?'

'জী-হাঁ, রাম-রাম!'

'ওকে চিনতে পারলে?'

'জী হাঁ, কিশোর থাপা! রাম রাম!'

'ব্যস। তবে এস। হত্যাকারী এখানেই আছে!'

ওরা তিনজনে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল লুটুবাবুর ঘরের সামনে। হেবো উঁকি মেরে দেখল, দরজার দিকে পিছন ফিরে লুটুমামা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় টাই বাঁধছেন। তাঁর গায়ে একটা সার্জের শার্ট, নিম্নাঙ্গে শুধু মাত্র আণ্ডারওয়্যার। প্রস্থানের প্রস্তুতি। হেবো সন্তর্পণে দরজাটা টেনে আলগোছে তুলে দিল শিকলটা। একটা শব্দ হল। লুটুমামা সচকিত হয়ে বলেন—'কে?'

হেবো বললে—'কংসমামার যম স্বয়ং কংশারি!'

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন লুটুমামা—'এই হতচ্ছাড়া বোম্বেটে বদমায়েশ! দরজা খোল শিগগির!'

হেবো প্রাণ খুলে হাসল। চিল্লাও যত পার! বাঘ এখন বন্দী!

রাম-রাম পুলিসকে দরজায় পাহারায় বসিয়ে হেবো তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে পড়ে থানার

উদ্দেশে। যাবার আগে বার-বার করে রাম-রাম পুলিসকে সতর্ক করে যায়—থানার দারোগা আসার আগে সে যেন কোন কারণেই শিকল না খোলে। তাহলে খুনী আসামী পালানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়বে তার ঘাড়ে। পুলিসটা রাম-রাম জপ করতে করতেই ঘাড় নেড়ে জানায়, নির্দেশটা সে ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছে।

ট্যাক্সি করে থানা-অফিসারকে নিয়ে আসতে সময় লাগল প্রায় আধ ঘণ্টা। ততক্ষণে বেশ সকাল হয়ে গেছে। ওরা এসে দেখে লাঠিটা বাগিয়ে ধরে রাম-রাম অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সকলে, মায় আশপাশের বাড়ির অনেকেই গণ্ডগোল শুনে এসে হাজির হয়েছেন। পথ-চলতি লোকও জমে গেছে বেশ। ভিতর থেকে লুটুমামা আপ্রাণ চিল্লাচ্ছেন—'এ সেই পাজি বদমায়েশ বোম্বেটেটার কাজ! আমার ট্রেন ফেল হয়ে গেল! মামা তুমি খুলে দাও দরজা!'

দাদুও রাম-রামকে বারে বারে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছেন—'লক্ষ্মী মানিক আমার, এইবার দরজা খুলে দাও, কিন্তু রাম-রামের তখন অন্য মূর্তি! একে সকাল হয়ে গেছে, তায় লোকজন অনেক এসেছে। আর তার ভূতের ভয় নেই। সে গোঁফে তা দিয়ে শুধু বলছে—'মাফ কিজিয়ে! বড়া-সাব থানাসে আ রহে হেঁ। বিন হুকুম ম্যয় কেওয়ারি নেহি খুলুঙ্গা!'

থানা-অফিসার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কোমর থেকে রিভলভার বার করে লুটুমামার উদ্দেশ্যে বললেন—'আমি এ থানার ও-সি! আমি দরজা খুলে দিচ্ছি। বেরিয়ে এস। পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করব। আমার হাতে পিস্তল।'

দরজা খুলে দেওয়া হল। বেরিয়ে এলেন অসমাপ্ত বেশে লুটুমামা। গোঁফজোড়াটা তাঁর ঝুলে পড়েছে। বলেন— 'এর মানে কী?'

হেবো বললে—'মানেটা, আপনি ধরা পড়ে গেছেন লুটুবাবু!'

লুটুবাবু চিৎকার করে ওঠেন—'চোপরাও, বজ্জাত বোম্বেটে ছোকরা!'

প্রাণখোলা হাসি হাসল হেবো।

দারোগা বলেন—'আপনাকে এক্ষুনি আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। অবশ্য ফুলপ্যান্টটা পরে নিতে পারেন আপনি।'

লুটুমামার পরনে তখনও সেই সার্জের শার্ট, নীল নেকটাই আর আণ্ডারওয়্যার। তিনি বলেন—'থানায়? কিন্তু কেন?'

'আপনাকে খুনের অপরাধে গ্রেপ্তার করছি আমি।'

লুটুমামা চমকে উঠে বলেন—'খুন? কে করেছে? কাকে খুন করেছে?'

হেবো বলে—'অভিনয় আপনার নিখুঁত কংসমামা—কিন্তু ওতে কোন কাজ হবে না। খুন হয়েছে বাহাদুর— গতকাল রাত্রে। তার রাক্ষসমূর্তিটাও চুরি গেছে। চুরি ঠিক যায়নি অবশ্য—আপনার জিনিসপত্র সার্চ করলেই সেটা পাওয়া যাবে। আর, কে খুন করেছে জিজ্ঞাসা করছিলেন? খুনীর নাম, নটোরিয়াস আর্টিস্ট লুটুমামা দি গ্রেট।'

লুটুমামার বাক্যস্ফূর্তি হয় না। চোখদুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

দাদু বললেন—'কে খুন হয়েছে? বাহাদুর? কিশোর থাপা?'

'হ্যাঁ দাদু! নৃশংস হত্যাকাণ্ড! তার কাটা মুণ্ডু পড়ে আছে তার ঘরে!'

ঠিক এই সময়ে একটা বজ্রপাত হল যেন! ঘটনাটা এমন ভয়ঙ্কর যে, স্বয়ং শার্লক হেবোর মত দুঃসাহসী গোয়েন্দাও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। তার মাথার মধ্যে টলে উঠল। চোখের উপর ভেসে উঠল যোজন বিস্তৃত ফুলে ভরা সরিষার ক্ষেত।

সংজ্ঞা হারিয়ে কাটা কলাগাছের মত দাদুর কোলে লুটিয়ে পড়ল হেবো।

গুরুতর ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে—ঠিক সেই সময়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসেছিল শ্রীমান কিশোর থাপা। তার মুণ্ডুটা ছিল গলাবন্ধ কোটের উপর স্বস্থানেই। তবে, তার হাতে ধরা ছিল একটা পিতলের থালা এবং তার উপর কিশোর থাপার দ্বিতীয় আর একটি মুণ্ডু।

রক্ত-মাংসের নয় মাটির। বিচিত্র হেসে বাহাদুর লুটুমামাকে এই সময় বলে ওঠে—হাঁ, সাব! মেরা শিরঠো আপ ভুল গয়ে থে! ম্যয় লায়া হজৌর কো ওয়াস্তে।'

দারোগার প্রশ্নের জবাবে বাহাদুর তার জবানবন্দিতে বলেছিল, গত এক সপ্তাহ ধরে লুটুমামা তাকে সামনে বসিয়ে তার একটা হেড-স্টাডি করছিলেন, কাল রাত্রে সেটা তিনি নিয়ে আসতে ভুলে যান। আর তার রাক্ষস মূর্তিটা? না, সেটা খোয়া যায়নি। গতকাল রাত্রে সে সেটা ট্রাঙ্কে তুলে রেখেছিল সাবধানতা অবলম্বন করে। আর মুণ্ডুটা পেতলের থালায়

বসিয়ে ও রেখে দিয়েছিল জানলার ধারে।

লুটুবাবু বাহাদুরের ভুলটা শুধরে দেন। বলেন—'ওটা রাক্ষস-মূর্তি নয় মোটেই—ওটা হচ্ছে লাফিং বুদ্ধ। চীনা ধরনের একরকম বুদ্ধমূর্তি। ভারতীয়, চীনা আর নেপালী ভাস্কর্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ আছে নাকি ঐ শিল্প নির্দেশনটিতে। তাই তিনি সেটা বাহাদুরের কাছ থেকে কিনতে চেয়েছিলেন। বাহাদুর রাজি না হওয়ায় সেটা আর সম্ভব হয়নি।

দাদু হেবোকে পরীক্ষা করে বললেন—'শক পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। মূর্ছা ভাঙতে দেরি হবে।'

মেজদা ভয়ে বলে—'ওষুধ দেবেন না কিছু?'

দাদু বলেন—'না, ওকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যাও। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে দাও ওকে, কেউ ওর ঘরে যাবে না।'

বিচক্ষণ ডাক্তার মৌলিক অত্যন্ত বুদ্ধিমান। বুঝেছিলেন, এমন কোনও ঔষধ নেই যাতে বেলা এগারোটা সতের মিনিটের আগে হেবোর মূর্ছা ভাঙানো যায়। তাই তিনি ব্যবস্থা করলেন, যেন লুটুবাবু ঐ এগারোটা সতেরর ট্রেনটা ধরতে পারেন।

এবার ছুটির শেষে কলকাতায় ফিরে এসে হেবো কাকে যেন একটা চিঠি লিখেছিল:

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার উপদেশে কর্ণপাত করি নাই বলিয়া আমি যৎপরোনাস্তি লজ্জিত। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। শিক্ষা আমার হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ছাত্রজীবনে আর গোয়েন্দাগিরি করিব না। ডিটেকটিভ বই পড়িব না, বাজে সিনেমা দেখিব না। বাবা, হেডমাস্টারমশাই এবং আপনার এত উপদেশেও যে প্রতিজ্ঞা করি নাই, আজ কেন তাহাই করিতেছি, তাহা জানিতে নিশ্চয় আপনার কৌতূহল হইতেছে। মার্জনা করিবেন— সে লজ্জার কাহিনী আমি বলিতে পারিব না। তবে দেখিবেন — আমার কথার নড়চড় হইবে না। আশীর্বাদ করুন যেন সত্য রক্ষা করিতে পারি।

ইতি—

আশীর্বাদভিক্ষু

শুধু হেবো।

খবর পেয়েছি হেবো তার প্রতিজ্ঞা এ-পর্যন্ত রক্ষা করে চলেছে। ডিটেকটিভ বই দেখলে নাকের ডগাটা আজকাল তার কেমন যেন কুঁচকে যায়—নিষিদ্ধ মাংসের গন্ধে যেমন হয় পরম বৈষ্ণবের। গোয়েন্দাগিরির যাবতীয় সরঞ্জাম সে বাক্সবন্দি করে রেখেছে।

একমনে শুধু পড়াশুনাই সে করছে আজকাল। সামনে হায়ার সেকেণ্ডারির বিরাট কোর্স। সে পরীক্ষায় তাকে স্কলারশিপ পেতেই হবে। তা হেবো পাবে। এতদিন অবশ্য ফাঁকি দেওয়াতে গোড়াটা কাঁচা রয়ে গেছে। তবু এত বুদ্ধি ওর, এত খাটছে . . . পাবে না?

তোমরা কী বল?

শার্লক হেবো ফিরে এলেন

শার্লক হেবোকে তোমরা চেন না। সে দোষ তোমাদের নয়, আমার। আমি একসময় শার্লক হেবোর কীর্তিকাহিনী লিখে বিখ্যাত হবার স্বপ্ন দেখতাম—ডক্টর ওয়াটসন যেমন বিখ্যাত হয়েছিলেন আসল শার্লক হোমস-এর গল্প লিখে। তোমাদের দাদা-দিদিরা যখন তোমাদের বয়সী তখন কিশোর শার্লক হেবোর কিছু কিছু কাণ্ডকারখানার কথা শুকতারায় লিখেছিলাম। তারপর নানান ধান্দায় তার কথা ভুলে বসে আছি। হেবো তখন হায়ার সেকেণ্ডারির ছাত্র ছিল; সে প্রতিজ্ঞা করেছিল হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার আগে আর গোয়েন্দাগিরিতে সে হাত দেবে না। তা সে প্রতিজ্ঞা হেবো রেখেছিল। রীতিমত স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করে এখন সে প্রেসিডেন্সিতে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে।

হেবো আমার ভাই-পো। সে জানত, তার কীর্তিকাহিনী নিয়ে আমি গল্প লিখতে চাই; কিন্তু তার মতিগতি দেখেই গোয়েন্দা-গল্প লেখা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানো? হেবোর মাথায় গোয়েন্দাগিরির ভূত চেপেছিল। পড়াশুনা সে কিছুই করত না—দিবারাত্র মাপবার ফিতে, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, বাইনোকুলার নিয়ে সে চোর-ডাকাত ধরে বেড়াত। তার অবস্থা দেখে আমার ভয় হত—শেষে যাদের জন্য গোয়েন্দা-গল্প লিখব তারাও না হেবোর মত লেখাপড়া চাঙে তুলে ঐ নিয়ে মাতে! সম্প্রতি আমার সে ভুলটা হেবো ভেঙে দিয়েছে। সে এখন আর বাচ্চা নয়, রীতিমত কলেজে-পড়া ছেলে। আজকাল আমার সঙ্গে গুরু গম্ভীর বিষয়ে আলোচনা করে। একদিন আমাকে এসে বললে, ছোটকাকু, তোমার

ধারণাটা কিন্তু ভুল। বাজে গোয়েন্দা গল্প পড়লে বুদ্ধিভ্রংশ হয় বটে, কিন্তু সত্যিকারের ভালো ডিটেকটিভ গল্পে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, অনুসন্ধিৎসা বাড়ে, দৃষ্টি গভীরতর হয়, বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে। গোয়েন্দা-গল্প মানে শুধু খুন-জখম নয়, গোয়েন্দা-গল্প মানে একটা বড় জাতের ধাঁধা। গোয়েন্দা সমাধান দেখবার আগে পাঠককে সমাধানে পৌঁছাতে হবে। সমাধানটা থাকবে পাঠকের চোখের সামনে, অথচ তার নজরে পড়বে না।

আমি বলি, কী রকম? একটা উদাহরণ দাও দেখি।

হেবো বলে, তুমি হিচককের 'রিয়ার-ইউণ্ডো' ফিলমটা দেখেছ? ধর আমার অবস্থাও ঐরকম। একটা অত্যন্ত রহস্যজনক জিনিস কদিন ধরে লক্ষ্য করছি। অবস্থাটা খুলেই বলি। আগেই বলে রাখছি, এটা একটা গোয়েন্দা গল্প। একটা রহস্য পৌঁছে দিয়ে আমি থামব, কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে সমাধানটাও জানিয়ে যাব। তুমি আমার প্রতিটি কথা মন দিয়ে শোন, দেখ আর পাঁচটা কথার সঙ্গে আমি যে সমাধানটা জানিয়ে গেছি সেটা ধরতে পার কি না :

একটা কালো মোটা আর অত্যন্ত বেঁটে লোক সামনের ঐ ফ্ল্যাট বাড়িটায় থাকে। একমুখ চাপ দাড়ি—দিবারাত্র গগলস পরে থাকে—দেখলেই মনে হয় লোকটা পাকা ক্রিমিন্যাল। ফ্ল্যাট বাড়িটা প্রকাণ্ড। নয় তলা উঁচু। লোকটা থাকে আটতলায়। দু-দুটো অটোমেটিক লিফট আছে। সন্দেহজনক লোকটাকে আমি আমার ঘর থেকে দিবারাত্র নজরে নজরে রেখেছি। বাইনোকুলারটা দিয়ে তাকে সবসময় লক্ষ্য করি। যতদূর শুনেছি, লোকটা কোন কারখানায় কাজ করে। কখনও দিনের বেলা তার ডিউটি থাকে, আবার কখনও বা রাতের বেলায়। দিনের বেলা দেখেছি লোকটা লিফট দিয়ে নেমে যায়, কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। কখনও বিকালে, কখনও সন্ধ্যারাত্রে ফিরে আসে। হাতে সব সময়েই একটা ফোলিও ব্যাগ। চুপচাপ লিফট বেয়ে উঠে যায় আট তলায়। লিফট-এর পাশেই ওর ঘর। চাবি খুলে ঢুকে যায় ভিতরে। কিন্তু যেদিন ওর নাইট-ডিউটি থাকে সেদিন ফিরতে ওর রাত দুটো বেজে যায়। সেদিন কিন্তু সে সোজা আটতলায় উঠে আসে না। ওঠে ছয়তলা পর্যন্ত। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আটতলায় উঠে আসে। আমি আরও লক্ষ্য করেছি, ঐ ছয়তলা থেকে আটতলায় সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় সে আমাকে খুঁজতে থাকে—দেখে, আমি দেখছি কি না। আমার উপস্থিতি টের পেলেই কেমন যেন ধরা পড়ে যাবার মত অবস্থা হয়। একছুটে বাকি সিঁড়ি কটা ভেঙে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে।

মাস-তিনেক ধরে ক্রমাগত লক্ষ্য করছি ব্যাপারটা। এ তিন মাসে সে একশ সতেরবার নেমেছে এবং দিনের বেলা বা সন্ধ্যারাত্রে সাকুল্যে পঁচাশিবার উঠেছে। প্রতিবারই লিফটে করে। নামা এবং ওঠা। আর বাকি বত্রিশবার সে ফিরেছে গভীর রাত্রে—তারমধ্যে একত্রিশ বারই সে লিফট বেয়ে উঠেছে ছয় তলায়, বাকি দুইতলা হেঁটে। আশ্চর্য—মাত্র একবার, সেদিন ঐ রাত দুটোর সময়েও আর একজন লোক তার সঙ্গে ছিল—সেদিন সে ছয়তলায় নামেনি। নিতান্ত ভালমানুষের মত আটতলায় লিফট-এ করে উঠে গিয়েছিল। এর কারণটা কী হতে পারে বল তো?

আমি বলি, নিশ্চয় ছয় বা সাত তলার কোনও ঘরের দিকে ওর নজর আছে। গভীর রাত্রে সে হয়তো কোন সুযোগের অপেক্ষায় ছয়-তলায় লিফট-টা ছেড়ে দেয়। তাই সে লক্ষ্য করে দেখে তোমাকে। বাইনোকুলার চোখে তোমাকে এ বাড়িতে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি হেঁটে নিজের ফ্ল্যাটে পালিয়ে যায়।

হেবো বললে, এই দেখ তোমার মনের মধ্যে পাপ আছে। সমাধান তোমার চোখের সামনে পড়ে রয়েছে। কিন্তু তুমি সন্দিগ্ধমনা হয়ে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছ।

আমি বলি, কি রকম? আর কোন সমাধান হতে পারে? কেন লোকটা গভীর রাত্রে বত্রিশ বারই শেষ দু'তলা হেঁটে উঠল?

হেবো বলে, বত্রিশবার নয় ছোটকাকু, একত্রিশবার . .

—হ্যাঁ, হ্যাঁ একত্রিশবার; কিন্তু একবার তো তার সঙ্গে আর একজন লোক ছিল। সেদিন তো আর . . . নাঃ! পারলাম না। বলে দাও?

—আমি প্রথমেই বলেছি, দুটি লিফটই অটোমেটিক। আর বলেছি, লোকটা অত্যন্ত বেঁটে। আসলে বেচারি ছয় নম্বর বোতাম পর্যন্ত হাত পায়। মাঝরাতে অটোমেটিক লিফটে বেচারি একা একা ওঠে। কাকে আর বলবে বলুন—'আট নম্বরের বোতামটা যদি কাইণ্ডলি—'

আমি হো হো করে হেসে উঠি।

ওর এই গল্প শোনার পরেই মনস্থির করলাম। হেবোর কীর্তি-কাহিনীগুলি তোমাদের জানানো উচিত। তাতে তোমাদের ক্ষতি হবে না, লাভই হবে।

হেবোর গল্পটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। অনেকবার অনেককে ঐ গল্প শুনিয়ে ঠকিয়েছি। লক্ষ্য করে দেখেছি ঐ 'অত্যন্ত বেঁটে আর 'অটোমেটিক লিফট' শব্দ দুটি কেউ খেয়াল করে দেখে না। লোকটার গগল্স্, ফোলিও ব্যাগ, সন্দিগ্ধ চলাফেরায় সকলেই বোকা হয়। একদিন অফিসে আমার সহকর্মীদের ঐ গল্পটি শোনাবার পর সুধীরবাবু বললেন, আচ্ছা! শার্লক হেবো তাহলে আপনার ভাইপো?

আমি অবাক হয়ে বলি, আপনি শার্লক হেবোকে চেনেন?

—চাক্ষুষ চিনি না, তবে তার কীর্তি কাহিনী একসময় শুকতারায় পড়েছিলাম। একদিন আপনার বাড়িতে গিয়ে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করে আসব।

আমি বলি, সে তো হেবোর সৌভাগ্য। শুধু হেবোর নয় আমারও।

সুধীরচন্দ্র বললেন, না; নরেনবাবু—এ প্রস্তাবের পিছনে একটি বিশেষ কারণ আছে। আমার জীবনে বিরাট একটা রহস্য আছে, জানলেন—তার সমাধান হয়নি। আজ দু-বছর ধরে ক্রমাগত চিন্তা করছি কোনও কুলকিনারা করতে পা[illegible]পারলে এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাজার হালে জীবন কাটাতে পারতাম।

আমি হেসে বলি, কী ব্যাপার? কোনও গুপ্তধনের সঙ্কেত খুঁজছেন? সেই 'পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা?'

সুধীরবাবু একটুও হাসলেন না। তাঁর চোখ দুটো ধ্বক করে জ্বলে উঠল। কাছে সরে এসে বললেন, একজ্যাক্টলি, নরেনবাবু! ঠিক তাই! আমি এক গুপ্তধনের মালিক, কিন্তু কিছুতেই তার নাগাল পাচ্ছি না।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়। এ যুগে আবার কেউ অমন গুপ্তধন সন্ধান পায় নাকি? কিন্তু সুধীরবাবুর মাথায় তো ছিট নেই—দিব্যি গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারী মানুষ। তিনি কেন এমন উৎকট রসিকতা করতে যাবেন?

প্রশ্ন করি, কী ব্যাপার বলুন তো?

সুধীরবাবু বলেন, এখানে নয়। শনিবার অফিস ছুটির পর একসঙ্গে আপনার বাড়িতে যাব। আপনার ভাইপোকে বাড়িতে থাকতে বলবেন। একটি অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক দলিলও আপনাদের দেখাব। আমার প্রপিতামহ দুর্লভচন্দ্রের একটি বিচিত্র দিনপঞ্জিকা।

শনিবার অফিস ছুটির পর সুধীরবাবুকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলাম। হেবোকে বলাই ছিল। সে কলেজ থেকে ম্যাটিনি শো-তে যায়নি। সোজাই বাড়ি চলে এসেছে। হেবোর সঙ্গে পরিচিত হবার পর সুধীরবাবু বললেন, হেবো, তোমার সঙ্গে দেখা করতেই আমি আজ এসেছি। তুমি যে নরেনবাবুর ভাইপো এ-কথা জানা থাকলে আরও আগে আসতাম। তোমার কিছু কিছু কাণ্ডকারখানা আমি অনেকদিন আগে শুকতারায় পড়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছে পারলে তুমিই এর সমাধান করতে পারবে।

—সমস্যাটা কী জাতের? খুনের কিনারা?

—না বাবা, হেবো, খুন-জখম নয়। আমি ছা-পোষা মানুষ। তবু ঘটনাচক্রে একটা গুপ্তধনের অধিকার পেয়েছি, অথচ তার চাবিকাঠিখানি পাইনি।

—গুপ্তধন! কার গুপ্তধন? —হেবো ঘনিয়ে আসে।

সুধীরচন্দ্র বলেন, আইনত তার মালিক আমি—যদি অবশ্য খুঁজে পাই।

হেবো উৎসাহিত হয়। বলে, সব কথা খুলে বলুন। কোনও তথ্যই অপ্রয়োজনীয় বলে বাদ দেবেন না।

সুধীরচন্দ্র যে কাহিনী বিস্তারিতভাবে বিবৃত করলেন, তা এই :

সুধীরচন্দ্র মধ্যভারতের এক বর্ধিষ্ণু জমিদারের শেষ বংশধর। তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ দুর্লভচন্দ্র আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে বিচিত্র ঘটনাচক্রে এক গুপ্তধন আবিষ্কার করে বসেন। দুর্লভচন্দ্র ছিলেন ইংরেজ সুবেদার। মধ্যপ্রদেশের একজন হিন্দু রাজা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করায় ইংরেজ সৈন্য তাঁর রাজত্ব আক্রমণ করে। সে যুদ্ধে রাজা নিহত হন। বস্তুতঃ নির্বংশ হন। ইংরেজ সৈন্য বহু আয়াসেও কিন্তু রাজার অতুল সম্পত্তির হদিস পায় না। দুর্লভচন্দ্র ছিলেন একজন দুর্লভ প্রতিভার মানুষ। যেমন ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য, তেমনি ছিল তার কূটবুদ্ধি। তিনি ঐ পরাজিত রাজার প্রাসাদে তাঁর একটি দিনপঞ্জিকা আবিষ্কার করেন, এবং সেই সূত্রে রাজার অতুল সম্পত্তির সন্ধান পান। ক্রমে দুর্লভচন্দ্র নিজেই হয়ে পড়েন বিরাট জমিদার। এলাহাবাদ শহরের মাইল খানেক দূরে যমুনার ধারে

প্রকাণ্ড একটি প্রাসাদ বানান। মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অতুল সম্পত্তির অধিকারী হলেও দুর্লভচন্দ্রের পারিবারিক জীবনটা সুখের হয়নি। প্রথম সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়েই স্ত্রী মারা যান এবং সেই প্রথম সন্তানও মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে মারা যায়। দুর্লভচন্দ্র তাঁর একমাত্র পৌত্র সুবলচন্দ্রকে নাবালক বয়সেই বিলাতে পাঠিয়ে দেন। সুবল বিলাতেই লেখাপড়া শেখেন। দাদুর মৃত্যুর টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি যখন দেশে ফিরে এলেন তখন তিনি যুবা পুরুষ। শোনা যায় দুর্লভচন্দ্রও তাঁর বিষয়সম্পত্তি ব্যাঙ্কে রেখে মারা যাননি। সুবলচন্দ্র বিলাত থেকে ফিরে এসে দেখেন ব্যাঙ্কে কোনও টাকা-কড়ি নেই। তিনিও নাকি ঐ দুর্লভচন্দ্রের একটি দিনপঞ্জিকা থেকে সন্ধান পান বৃদ্ধ কোথায় টাকাকড়ি পুঁতে রেখে গেছেন। কী-ভাবে তিনি ও গুপ্তধনের সন্ধান পান তা জানা যায় না। এই সুবলচন্দ্রও ছিলেন পণ্ডিতব্যক্তি। তিনি হচ্ছেন আমাদের সুধীরবাবুর পিতামহ। মজা হচ্ছে এই, সুবলচন্দ্র যখন মারা যান তখন সুধীরবাবুর বাবাও ছিলেন বিদেশে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি দেখেন এবারও ব্যাঙ্কের পাশবইতে সম্পত্তি আছে নিতান্ত সামান্য। সুবলচন্দ্র নিশ্চয় কোথাও তাঁর সোনা-দানা-হীরা-জহরৎ পুঁতে রেখে গেছেন—কিন্তু কেউ তার হদিস পায়নি। দু-পুরুষ ধরে অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছে—কিন্তু কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি। গুপ্তধন তো দূরের কথা, এবার সুবলচন্দ্রের কোনও দিনপঞ্জিকাই উদ্ধার করা যায়নি। বাড়িটা প্রায় একশ বিঘা জমির চৌহদ্দিতে। সাবেক আমলের ফুলের বাগান, ফলের বাগান, পুকুর, মন্দির নিয়ে প্রকাণ্ড এলাকা। আন্দাজে অনেক খোঁড়াখুড়ি করা হয়েছে দু-পুরুষ ধরে। কিন্তু গুপ্তধনের কোন সন্ধান মেলেনি। সারা চৌহদ্দিটাই কোপানো হয়েছে। মোহর পাওয়া যায়নি, পাওয়া গেছে শুধু আলু।

—আলু! মানে? —অবাক হয়ে হেবো প্রশ্ন করে।

সুধীর বাবু বলেন, মাটিটা যখন কোপানোই হত তখন সেটা ফেলে দিয়ে কী লাভ? আলুর চাষ করা হত বছর-বছর! এতদিনের বাড়ির সব ভেঙে গেছে। সবটাই জঙ্গল হয়ে গেছে। তবু জমিটা আমরা দু-পুরুষ ধরে বিক্রি করতে পারিনি। বেচলে আজও ভাল দাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাহলে গুপ্তধনও যে বেহাত হয়ে যাবে।

হেবো বললে, সুবলচন্দ্রের কোনও দিনপঞ্জিকা, বা কাগজপত্র কি পাওয়া যায়নি?

—কাগজপত্র প্রচুর আছে। দলিল-সস্তাবেজ, চিঠিপত্র—কিন্তু দিনপঞ্জিকা বা ডায়েরি বলতে যা বোঝায় তা নেই। বাবার বিশ্বাস ছিল, এব আমারও তাই ধারণা—কোন নির্দেশ রাখলে দাদু নিশ্চিয়ই তা একটি স্বহস্তে লিখিত দিনপঞ্জিকাতেই রাখতেন। সেটাই আমাদের বংশের ঐতিহ্য। রাজা-সাহেবের সম্পত্তির হদিস দুর্লভ চন্দ্র পেয়েছিলেন তাঁর দিনপঞ্জিকায়। ফলে—

বাধা দিয়ে হেবো বললে, সুবলচন্দ্রের হস্তাক্ষর আপনি চিনতে পারবেন?

—নিশ্চয়।

হেবো বলে, এ রোগের চিকিৎসা দূর থেকে করা সম্ভব। সরেজমিনে তদন্ত করতে হবে।

আপনার দাদু নিশ্চয়ই একটি ডায়েরি রেখে গেছেন, সেটা আপনারা খুঁজে পাননি।

সুধীরবাবুর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বললেন, ঘর-দোরের যা অবস্থা তাতে এতদিন পরে সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

হেবো বললে, আচ্ছা রাজা-সাহেবের কিংবা দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকা আপনি দেখেছেন?

—রাজা সাহেবেরটা দেখিনি, তবে দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকাটা আমার কাছে এখানেই আছে। তোমাকে এনে দেখাব। তার শেষ দিকে একটা ধাঁধা আছে, যেটার সমাধান করে সুবলচন্দ্র গুপ্তধনের উদ্ধার করেন। অবশ্য কেমন করে তা করেন, তা আজও আমি জানি না। আমার কাছে সেটা আজও ধাঁধার পর্যায়ে।

—বেশ, সেটাই আমাকে এনে দেখান। চোর-ডাকাত কিছু কিছু ধরেছি, কিন্তু গুপ্তধন উদ্ধারের কোন অভিজ্ঞতা আমার নেই। একমাত্র সেই রবীন্দ্রনাথের 'পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা' ছাড়া। দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকা এনে দিন। আগে দেখি, সে ধাঁধাটার সমাধান করতে পারি কি না।

সুধীরবাবু বললেন, বলছ, এনে দেব; কিন্তু সেটা তো পণ্ডশ্রম। আসলে তোমাকে যেতে হবে আমাদের দেশে। সরেজমিনে তদন্ত করতে। পুজার ছুটিতে।

হেবো বললে, না, পণ্ডশ্রম নয়। দুর্লভচন্দ্রের ধাঁধাটার সমাধান করে একটু হাত পাকিয়ে নিই প্রথমে।

পরদিন সুধীরবাবু দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকাটি পৌঁছে দিয়ে গেলেন। হাতে তৈরি কাগজে, মানে হ্যাণ্ড-মেড পেপারে— পুঁথির আকারে বইটি লেখা। দেখলেই বোঝা যায় তার বয়স শতখানেক বছর। পাতাগুলো বাঁধানো নয়। পুঁথির পৃষ্ঠার মতো সযত্নে সাজানো। পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া নেই; কিন্তু প্রত্যেক পৃষ্ঠার মাথায় প্রথমেই দুর্লভচন্দ্র তারিখটা বসিয়েছেন। ফলে পৃষ্ঠাসংখ্যা সাজানোতে কোন অসুবিধা নেই। কালো কালিতে গোটা-গোটা হস্তাক্ষরে খাগের কলমে লেখা।

সেদিন ছিল রবিবার। ছুটির দিন। হেবো সকাল থেকে সেই পুঁথি নিয়ে পড়েছে, নাওয়া খাওয়া ভুলে। দিনপঞ্জিকার শুরু হয়েছে ৩. ৮. ১৮৫২ থেকে, আর শেষ হয়েছে ৫. ৬. ১৮৬২-এ। শেষ তিনখানি পৃষ্ঠায় দুর্লভচন্দ্র বর্ননা দিয়েছেন, তিনি কী-ভাবে রাজা-সাহেবের লুকানো গুপ্তধন উদ্ধার করেন এবং কীভাবে নিজেও তা লুকিয়ে রেখে যান। তোমরা যাতে হেবোর মতো এ সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পার, তাই সেই দিনপঞ্জিকার শেষ তিনখানি পৃষ্ঠা এখানে হুবহু নকল করে দিলাম :

বৃহস্পতিবার, ৩রা জুন, ১৮৬২

অতঃপর একদা দুর্গের পতন হইল। পরীখা অতিক্রম করতঃ ইংরাজসৈন্য পিপীলিকা-শ্রেণীবৎ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। সূর্যাস্তের পূর্বেই রাজা সবংশে নিহত হইলেন। মেজর ম্যাকফার্লং তৎপরে দুর্গাধীপের পদ গ্রহণ করতঃ আদেশজারী

করিলেন সিপাহীগণ দুর্গের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ, প্রতিটি প্রত্যন্তদেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করুক। আদেশ পালিত হইল। পরন্তু রাজার অতুল ঐশ্বর্য্যের—হীরা মুক্তা রত্নরাজির সন্ধান কেহই পাইল না। সর্ব্বশেষে দুর্গাধীপ বৃথা অন্বেষণে কালক্ষেপে বিরত হইলেন। পরন্তু আমার হৃদয় ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ অর্ণবের ন্যায় অশান্তই রহিয়া গেল। আমি সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করিতে থাকি—ইহা কী প্রকারে সম্ভব? এত অল্প সময়ে রাজা কেমন করিয়া ঐ রত্নরাজি লুক্কাইত করিলেন? ঐ সময়ে রাজা-সাহেবের দিনপঞ্জিকাটির প্রতি নজর পড়িল। তাহা সর্ব্বচক্ষুর সম্মুখেই পড়িয়া ছিল। আমার সন্দেহ হইল, হয়তো রাজা-সাহেব ঐ দিনলিপিতে এ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন। আমি সেটি যত্নসহকারে পাঠ করিতে থাকি। দিনপঞ্জিকার সর্ব্বত্র সহজ ও সরল ভাষা। শুধুমাত্র শেষ পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদটুকু সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য।

উক্ত শেষ পৃষ্ঠার প্রথমে রাজা-সাহেব তাঁহার ইষ্টদেবী বিমলার প্রতি একটি প্রার্থনাবাণীর উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তৎপরেও কিছুটা বুঝা যায়; কিন্তু শেষ অংশ সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য! রাজা-সাহেবের দিন পঞ্জিকার ঐ অংশটি আমি হুবহু নকল করিয়া দিতেছি!

"বিমলাদেবৈঃ নমঃ
নটস্য পশ্চিমে ভাগে বিমলা বিমলে প্রদা
তস্যাদর্শন মাত্রেণ বিদ্যাবান জায়তে নরঃ।।

"অদ্য আমার ঘোর দুর্দ্দিন। প্রাতে সভারম্ভে সর্ব্বপ্রথম সভাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবম পাঠের প্রস্তাব করিলেন। প্রথম শ্লোকটি সবেমাত্র পাঠ করিয়াছেন—'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি হিমালয়ঃ নাম নগাধিরাজঃ' অমনি ভগ্নদূত আসিয়া সংবাদ দিল সেনাপতি বাস্তা পাঠাইয়াছেন—ইংরাজসৈন্য পার্বতীপুরের দুর্গ বিচূর্ণ করিয়া অতঃপর এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। তৎক্ষণাৎ সভাভঙ্গ হইল। আত্মরক্ষায় যত্নবান হইলাম। আমি মা-বিমলার ভক্ত। মৃত্যুকে ভয় করি না। পরন্তু স্ত্রীপুত্র পরিজনদিগের কী ব্যবস্থা করিব? একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে পার্শ্ববর্ত্তী 'বিভাপন' গ্রামে আমার শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিলাম। ঈশ্বর কৃপা করিলে তাহারা রক্ষা পাইবে। পরন্তু আমার অমূল্য রত্নারাজির কী ব্যবস্থা করিব? তাহাও তৎক্ষণাৎ অপসারিত করিলাম। কোথায় তাহা রাখিলাম সে কথা জানি শুধু আমি এবং আমার একান্তসহচর লক্ষ্মণদেব, এবং মা-বিমলা। পরন্তু অদ্যকার যুদ্ধে আমি এবং লক্ষ্মণদেব দুই জনেই নিহত হইতে পারি। তাই আমার ভবিষ্যদ্বংশীয়ের উদ্দেশ্যে এই সাবধানবাণী লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি। অবধান কর :

"শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকদলের প্রথম সারির প্রথম চারিটি সৈন্যের শিরচ্ছেদ করিবে

এবং কবন্ধগুলি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের বিপথগামী করিবে। দ্বিতীয় সারির সৈন্যদলের প্রথম চারিটি সৈন্যকে অতিক্রম করিয়া পঞ্চম সৈন্যকে আক্রমণ কর। পরন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় সৈনিকদ্বয়কে সম্পূর্ণ অবহেলা করিও না।"

রাজা-সাহেবের দিনপঞ্জিকার ঐ শেষ উপদেশটি লইয়া আমি নিরন্তর চিন্তামগ্ন থাকিতাম। সৈনিকদের শিরশ্ছেদ করার পর কবন্ধ পরিত্যাগ করিয়া কী-রূপে তাহাদের বিপথগামী করা যায়? তাহা ভিন্ন ঐ সৈন্যদের কাটাকাটি করিয়া কী-ভাবে গুপ্তধনের সন্ধান সম্ভব একথা আমরা বোধগম্য হইল না।

শুক্রবার, ৪ঠা জুন, ১৮৬২

দীর্ঘদিন ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে একদিবস বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় আমার নিকট ঐ গুঢ়-সংকেতের অর্থ প্রতীয়মান হইল। রাজা-সাহেব আদৌ প্রলাপোক্তি করেন নাই। অতি সুকৌশলে তিনি তাঁহার ভবিষ্যদ-বংশীয়দিগের হিত্যর্থে গুপ্তধনের নির্দেশ ঐ সাঙ্কেতিক ভাষায় রাখিয়া গিয়াছেন। আমি এইভাবে সমাধানে উপস্থিত হইলাম : রাজা-সাহেবের মুখ্য উদ্দেশ্য গুপ্তধনের অবস্থান জ্ঞাপন করা। নিঃসন্দেহে তাহা ভাষার মাধ্যমে করিতে হইবে। ভাষার মৌল উপাদান বাক্য এবং বাক্য শব্দ বা অক্ষর-সমষ্টির দ্বারা নির্মিত। সুতরাং রাজা-সাহেব কিছু 'অক্ষর' খুঁজিতেছেন। এদিকে দেখিতেছি নির্দেশে কোনও সৈন্যের শিরশ্ছেদ করিয়া, কবন্ধগুলি ত্যাগ করিতে বলিতেছেন। শিরশ্ছেদের পর কবন্ধ ত্যাগ করিলে 'মুণ্ড' পড়িয়া থাকে। সম্ভবতঃ তিনি কোনও কোনও পদের প্রথম অক্ষরগুলি গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতেছেন। এস্থলে প্রথম সারির সৈন্য বলিতে তিনি সর্ব প্রথমে লিখিত ঐ-বিমলাদেবীর প্রসঙ্গে শ্লোকটিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাহার প্রথম চারিটি সৈনিক—অর্থাৎ প্রথম চারিটি শব্দ হইতেছে 'নটস্য পশ্চিমে ভাগে বিমলা।' তাহাদের শিরশ্চেদ করতঃ অর্থাৎ প্রথম চারিটি অক্ষর গ্রহণ করিয়া কবন্ধ ত্যাগ করিলে পাই 'ন-প-ভা-বি'। পরবর্তী নির্দেশ এই চারিটি অক্ষরকে বিপথগামী করিতে হইবে, অর্থাৎ বিপরীত দিক হইতে পাঠ করিতে হইবে। উল্টা করিয়া সাজাইলে পাইতেছি—'বিভাপন'। সেটি পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম—রাজা-সাহেবের শ্বশুরালয়। বুঝিলাম, গুপ্তধন ঐ গ্রামেই সংরক্ষিত। কিন্তু গ্রামের কোথায়? কোন প্রান্তে। পুনরায় দেখিতেছি রাজা-সাহেব বলিয়াছেন দ্বিতীয় সারির সৈন্যদল, অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্লোকটির '—অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি হিমালায়ঃ নাম নগাধিরাজঃ' প্রথম চারিটি শব্দকে অতিক্রম করিয়া পঞ্চম শব্দটিকে আক্রমণ করিলে পাই—'নগাধিরাজ।' আশ্চর্য্য! ঐ বিভাপন গ্রামে একটি শিবমন্দির বিরাজমান, যাহার বিগ্রহের নাম নগাধিরাজ! কূটচক্র ভেদ করিয়া আমার সর্ব্ববয়বে রোমাঞ্চ হইল। অতঃপর মেজর ম্যাকফার্লন সাহেবের নিকট দিবসত্রয়ের নিমিত্ত অনুপস্থিতি অগ্রিম আর্জ্জি পেশ করিলাম। বলিলাম,

পার্শ্ববর্তী গ্রামে আমার একজন আৎমীয় আছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি। ছুটি মঞ্জুর হইল। আমি একাকী ঐ বিভাপন গ্রামে উপনীত হইলাম। নগাধিরাজ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দুই দিবস বৃথা অন্বেষণ করিলাম। কোনও সংকেত দৃষ্টিগোচর হইল না। ঐ সময় নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে বিদ্যুৎচমকের ন্যায় স্মরণ হইল—রাজা-সাহেবের আরও একটি নির্দেশ ছিল, যাহা এতাবৎকাল আমি গ্রাহ্য করি নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, 'পরন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় সৈন্যদ্বয়কে সম্পূর্ণ অবহেলা করিও না।' সেই দুইটি শব্দ হইতেছে 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি' অর্থাৎ উত্তর দিকে আছে। 'বিভাপন' গ্রামের নির্দেশ পাইয়াছি 'নগাধিরাজ' মন্দিরের নির্দেশ পাইয়াছি, এখন নির্দেশ পাইলাম—'উত্তর দিকে আছে।' আমি নগাধিরাজ মন্দির হইতে উত্তরাভিমুখে চলিতে শুরু করিলাম। লক্ষ্য হইল, সেদিকে গ্রাম্য পথ নাই—বিজন অরণ্য! তাহা হউক। আমি সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। এক্ষণে দেখিলাম—ঘনপত্রগুল্ম কণ্টকাকীর্ণ সেই অরণ্যের অভ্যন্তরে সম্প্রতি মনুষ্যাগমনের চিহ্ন রহিয়াছে। দুই একটি বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া যেন কিছুদিন পূর্বেই কেহ এ অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। অরণ্যের বিপরীত প্রান্তে কোনও গ্রাম নাই, যমুনার তট। যমুনাতে যাইবার অসংখ্য পায়েচলা পথ রহিয়াছে। ফলে অরণ্য-অভ্যন্তরে যে প্রবেশ করিয়াছিল সে ঐ পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তাহার অর্থ সে গভীর অরণ্যে কোন কিছু লুক্কায়িত রাখিতে গিয়াছিল। ছিন্ন বৃক্ষশাখার সঙ্কেত চিহ্ন লক্ষ্য করিতে করিতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ অতিক্রম করিলাম। তৎপরে একটি উন্মুক্ত স্থান দৃষ্টিগোচর হইল। এই স্থান অরণ্যের বাহির হইতে কিছুতেই লক্ষ্য হইবে না। দেখিলাম, প্রায় চারিহস্ত পরিমিত বর্গক্ষেত্রে লতাগুল্মাদি পরিষ্কার করা হইয়াছে। সে-স্থলে কে বা কাহারা একটি গর্ত্ত মৃত্তিকাদ্বারা বন্ধ করিয়াছে। আমার রোমাঞ্চ হইল। অনুধাবন করিলাম, গন্তব্যস্থলে উপনীত হইয়াছি। দিবাভাগে খনন করিতে সাহসী হইলাম না। স্থানটি অন্তরে চিহ্নিত করিয়া অরণ্য হইতে নির্গত হইলাম। লোকালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটি খনিত্র সংগ্রহ করিয়া নগাধিরাজ-মন্দিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি। প্রথম প্রহরে শিবাকুলের সঙ্কেত পাইয়া নগাধিরাজ মন্দিরে প্রণাম পূর্ব্বক আমি খনিত্রসহ পুনরায় অকুস্থলে পুনরাগমন করিলাম। তিন দণ্ডকাল নিরন্তর কায়িক পরিশ্রমে মনুষ্যদেহ পরিমাণ গর্ত্ত খনন করিতে আমার দেহে শ্রমজল নির্গত হইল। তৎপরে কোনও কঠিন ধাতব পদার্থে আমার খনিত্র প্রতিহত হইল। একটি মঞ্জুষা পাইলাম। তাহা উন্মোচন করিতেই ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে রাজা-সাহেবের অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি ঝলমল করিয়া উঠিল। আমি বজ্রহত হইয়া গেলাম।

আমি এক্ষণে অতুল বৈভবের অধিকারী হইয়াছি। এক্ষণে আমার সমস্যা এই অতুল ঐশ্বর্য্য সমভি-

শনিবার, ৫ই জুন ১৯৬২

ব্যাহারে কী প্রকারে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব? কী প্রকারে হীরামুক্তা-মাণিক্য মোহর ও তঙ্কায় রূপান্তরিত করিব? যদ্যপি তাহা সঙ্গোপনে করিতে সক্ষম হই তাহা হইলে শুধু আমি নহি, অস্মদবংশীর অধঃস্তন সপ্তপুরুষ শতাধিক বৎসরকাল বিনা আয়াসে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবে। রাজা-সাহেব আমাকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন তাহা আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না। আমিও চোর-তস্কর হস্তলাঘবদিগের এবং স্বার্থলোলুপ আত্মতীয় পরিজনের লোলুপ দৃষ্টি হইতে আমার এ গুপ্তধন একই কৌশলে লুক্কায়িত রাখিব। ঈশ্বর আমাকে একহস্তে অপরিমে সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু অপর হস্তে আমার দুর্ভাগ্যের পশরাও পূর্ণ করিয়াছেন। অলৌকিকভাবে অতুল ঐশ্বর্য পাইয়াছি বটে, কিন্তু পারিবারিক জীবনে সুখী হইতে পারি নাই। প্রথম সন্তান প্রসব করিতেই ধর্মপত্নী লোকান্তরিত হইলেন। একমাত্র পুত্র কল্যাণীয় নির্মলচন্দ্র এবং তাহার পত্নী অকালে ইহজগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। আমার একমাত্র স্নেহের পাত্র, একমাত্র বংশধর কল্যাণীয় শ্রীমান সুবোধচন্দ্র আশৈশব বিলাতেই রহিয়াছে। তাহাকে এই বৃদ্ধের বক্ষপঞ্জরে আবদ্ধ করিবার সৌভাগ্য হইতে আমি বঞ্চিত। আমার সমস্ত জীবনে একটি সত্য প্রণিধান করিয়াছি : বিত্তবানদিগের সন্তানেরা অধিকাংশই বিপথগামী হয়। যে হেতু পৈত্রিক সম্পত্তি স্বোপার্জিত নহে তাই তাহার প্রতি কোনও মমত্ব জন্মে না। এই ঊনবিংশতি শতাব্দীতে অধিকাংশ বিত্তবানের পরিবারেই তাই অত্যন্ত ঘৃণ্য 'বাবু-কালচার' জঘন্যরূপে প্রকট হইয়া পড়িতেছে। এজন্য স্থির করিয়াছি, আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমিও রাজাসাহেবের ন্যায় লুক্কায়িত রাখিয়া যাইব। এই দিনপঞ্জিকাতেই রাখিয়া যাইব বজ্রকূট সমস্যা-সমাকীর্ণ আমার নির্দেশ। আমার দেহান্তে শ্রীমান সুবোধচন্দ্র যদি এই সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই সে এই ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে। নচেৎ নহে। শ্রীমান সুবোধচন্দ্রের প্রতি আরও নির্দেশ দিতেছি, যদ্যপি সে এই সমস্যার সমধানে সক্ষম হয়, সম্পত্তি উদ্ধার করিতে পারে, তাহা হইলে সেও যেন অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া তাহার পুত্র পৌত্রদিগের জন্য সমস্যা-সমাকীর্ণ গুপ্তধন রাখিয়া যায়। এ সব সহজলভ্য নয়। প্রতিটি পুরুষেই ইহা স্বোপর্জিত হওয়া চাই। অতঃপর শ্রীমান সুবোধচন্দ্র অবধান কর :

সপ্ত-কূপ গবাক্ষের বিপরীতমুখী বেদব্যাসের পরিমাণ

= দশ আলোকবর্ষ।

ধ্রুব-নক্ষত্র তীব্র শলাকায় বিদ্ধ করিতে হইবে। ধ্রুব নক্ষত্রের অবস্থান 'অবস্থানের' জ্যোতির্ময় আদিবিন্দুতে।

তুলাদণ্ড : এক আলোকবর্ষ = একমিমি।

ধ্রুবসত্য লাভে সপ্তঋষির দূরত্ব :

ক্রতু = ৪৯ আলোকবর্ষ
পুলহ = ৭৯ আলোকবর্ষ
অত্রি = ৫২ ঐ
অঙ্গিরা =৬৭ ঐ
পুলস্ত্য = ৮০ ঐ
বশিষ্ঠ্য = ৭৮ ঐ

ক্রতু-অত্রি = ৪৪ আলোকবর্ষ।
অঙ্গিরা-পুলস্ত্য = ৪৪ ঐ
ক্রতু-পুলস্ত্য = ৪৬ ঐ
অঙ্গিরা-বশিষ্ঠ্য = ২০ ঐ
বশিষ্ঠ্য-মরীচি = ৩০ ঐ
পুলস্ত্য-মরীচি = ৮০ ঐ

তদুপরি অবধান কর :

কূটচক্র ভেদের কুঞ্চিকা :

দুন্দুভি মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজিয়া উঠিল। প্রহাচার্য আমার জন্ম-পত্রিকা বিচার করিলেন। তখন প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জানিলাম যে, আমার শনির দশা। রাহু আছেন পঞ্চমস্থানে। দেবগুরু বৃহস্পতি চতুর্বিংশতি নক্ষত্র শত-ভিষার অবস্থানের জন্য আমার এই দুঃসময় চলিতেছে। প্রহাচার্য তখন আমার হস্ত-রেখা বিচার করিয়া বলিলেন আশঙ্কা করার কিছু নাই। বৃহস্পতির সংক্রমণের পরে অর্থাৎ অদূরে সৌভাগ্য-সূর্যের উদয় সম্ভাবনা।

বুঝিলাম তখন নতুন করিয়া সব রকম বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহার অর্থ আমার দুর্দিনের অবসান ঘটিবে মকর সংক্রান্তিতে।

বৎস সুবোধচন্দ্র! এ-কথা ভুলিও না যে, বজ্র-শলাকাবিদ্ধ ঐ ধ্রুবনক্ষত্রের চর্তুপার্শ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল ক্রমাগত চক্রাবর্তন করিতেছেন। সেই চক্রাবর্তন-দৃশ্যেই সপ্তর্ষির আশীর্বাদে তুমি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইবে।"

* * *

দুন্দুভি মৃদঙ্গ মন্দিরা প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল। গ্রহাচার্য আমার জন্ম পত্রিকা বিচার করিয়া দিলেন। তখন নানান প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে জানিতে পারিলাম যে আমার শনির দশা চলিতেছে। রাহু আমার পঞ্চমস্থানে আছেন। বৃহস্পতি চতুর্বিংশতি নক্ষত্র শত বিষার অবস্থানের জন্যই আমার এখন দুঃসময় চলিতেছে। গ্রহাচার্য তখন আমার হস্তরেখা বিচার করিয়া বলিলেন আশঙ্কা করার কিছু নাই। বৃহস্পতির সংক্রমণের পরে অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে আবার আমার সুদন আসিবে।

বুঝিলাম তখন নতুন করিয়া সব রকম বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সংক্ষেপে বুঝিলাম আমার দুর্দিনের অবসান ঘটিবে মকর সংক্রান্তিতে।

দীর্ঘ এক সপ্তাহ আমরা খুড়ো-ভাইপো ঐ সমস্যাটা নিয়ে পড়ে রইলাম। হেবোর মেজদা,—সে এখন চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়ে,—সেও এগিয়ে এল আমাদের সাহায্য করতে। কিন্তু দুর্লভচন্দ্রের ঐ দুর্লভ ধাঁধাটির সমাধান করা গেল না। দিন সাতেক ধস্তাধস্তি করার পরে, আবার একদিন সুধীরবাবু এসে হাজির। বললেন, কী স্থির হল? আপনারা কি এলাহাবাদ যাবেন? বন্দোবস্ত করব?

হেবো কিছু বলার আগেই তার মেজদা বলে ওঠে, সেটা তো করতেই হবে। এখনও বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছে। চলুন সবাই মিলে ঘুরে আসি।

হেবো বললে, কিন্তু তার আগে দুর্লভচন্দ্রের সমস্যাটা সমাধান করতে হবে যে—

মেজদা বললে, কেন? দুর্লভচন্দ্রের ধাঁধা সল্‌ভ করলে কোন চতুর্বর্গলাভ হবে? ও ধাঁধা তো একশ বছরের পুরানো। আর আমরা না পারলেও ওটা যে সুধীরবাবুর ঠাকুর্দা সল্‌ভ করেছিলেন সে খবর তো জানাই গেছে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ওঁর ঠাকুর্দা যে সমস্যা রেখে গেছেন . . . .কিন্তু, তাঁর কোন দিনলিপিই খুঁজে পাওয়া যায় নি। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সুধীরবাবুর সেই এলাহাবাদের বাড়িতে গিয়ে তন্নতন্ন করে খোঁজা। সবার আগে উদ্ধার করতে হবে ওঁর ঠাকুর্দার কোন ডায়েরি আছে কি না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ঠাকুর্দা কবে মারা যান? তখন আপনারা কোথায়?

সুধীরবাবু বললেন, দাদু মারা যান ১৯৬৪ সালে। তখন আমি পুনা কলেজে পড়ি। বাবা তখন পুনাতে পোস্টেড। দাদুর অসুখের খবর পেয়ে বাবা আর আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম তার আগেই দাদু মারা গেছেন। তারপর বাবা এবং আমি অনেক খুঁজেছি, কিন্তু দাদুর কোন ডায়েরি বা দিনপঞ্জিকা উদ্ধার করতে পারিনি।

হেবো বললে, আপনার বাবা বেঁচে আছেন?

—না, তিনিও দেহ রেখেছেন। আমি বাবার একমাত্র সন্তান। সুতরাং ঐ সম্পত্তিটা এখন আমার। ভালো অফার পেয়েছি। বেচে দিলে এই দুর্দিনের বাজারে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পারি, কিন্তু—

বাধা দিয়ে হেবোর মেজদা বললে, খবর্দার অমন ভুল করবেন না। আপনার ঠাকুর্দার ডায়রি নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে—

সুধীরবাবু বলেন, তাহলে সেই ব্যবস্থাই করি? আমরা চারজনই যাচ্ছি তো।

আমি হেবোর দিকে ফিরে বলি, কি রে হেবো? তাই তো ঠিক হল?

হেবো তখনও সেই পুঁথিটার মধ্যে কি যেন দেখছিল। বললে, না ছোটকাকু, এখন নয়। আগে এই দুর্লভচন্দ্রের ধাঁধাটা সল্‌ভ করি।

হেবোর মেজদা খিঁচিয়ে ওঠে—ঐ তোর বড় দোষ হেবো! শুনছিস এটা দুর্লভচন্দ্রের ডায়েরি। এ ধাঁধা সল্‌ভ করে আমাদের কি পাখা গজাবে?

হেবো সে-কথার জবাব না দিয়ে সুধীরবাবুকেই প্রশ্ন করে, আপনি কোনদিন আপনার দাদুর কাছে জানতে চাননি, তিনি কী-ভাবে দুর্লভচন্দ্রের ঐ ধাঁধাটার সমাধান করেছিলেন?

সুধীরবাবু মাথা নেড়ে বলেন, না। এ বিষয়ে দাদুর জীবিতকালে তাঁর সঙ্গে আমার কোন কথা হয়নি। বাবারও হয়নি। দাদু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং তাঁর ছিল ভীষণ মন্ত্রগুপ্তি। বস্তুত দুর্লভচন্দ্রের এই দিনলিপিটি বাবা এবং আমি প্রথম দেখতে পাই দাদু মারা যাবার পর। তাই আমি জানি না, দাদু কী-ভাবে দুর্লভচন্দ্রের ঐ শেষ ধাঁধাটার সমাধান করে গুপ্তধনের নাগাল পেয়েছিলেন।

হেবো বললে, আপনার দাদুর মৃত্যুর পরে আপনারা সব কিছু তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন। অথচ তাঁর কোনও দিনপঞ্জিকা খুঁজে পাননি। সুতরাং এতদিন পরে গিয়ে নতুন করে খুঁজে লাভ হবে না—

মেজদা বললে, অন্তত আমরা এখানে-ওখানে খুঁড়ে তো দেখতে পারি?

হেবো বললে, কী বলছ মেজদা? বাড়িটার চৌহদ্দি একশ বিঘার উপর! গুপ্তধন যদি ওখানে থাকে তবে তা আছে অন্তত দু-মিটার মাটির গভীরে। আন্দাজে কী তা খুঁড়ে বার করা সম্ভব?

—তবু চেষ্টা করে দেখলে কি কিছু পাওয়া যাবে না?

হেবো বললে, যাবে। আলু! গুপ্তধন নয়!

মেজদা চটে উঠে বলল, তাহলে তুই কি করতে চাস? এখানে বসে বসে ন্যাজ নাড়বি?

হেবো বললে একজ্যাক্টলি! এখানে বসে বসে ন্যাজ নাড়ব আর দুর্লভচন্দ্রের সমস্যাটার সমাধান বার করবার চেষ্টা করব! এ সমস্যার সমধান না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী কর্মপন্থা আমি নির্ধারণ করতে অপারগ!

অগত্যা সুধীরবাবু প্রায় নিরাশ হয়েই ফিরে গেলেন।

কদিন পরে হেবো আমার কাছে এসে বললে, ছোটকাকু, আকাশে এখন সপ্তর্ষি আছে? চিনিয়ে দিতে পার?

বললাম, এখন তো সন্ধ্যাবেলাতেই উত্তর আকাশে সপ্তর্ষিকে দেখতে পাওয়ার কথা। চল দেখা যাক।

আমরা দুজনে ছাদে উঠে গেলাম। হেবোকে চিনিয়ে দিলাম সপ্তর্ষিমণ্ডল। বললাম, সপ্তর্ষি-মণ্ডলের প্রথম দুটি নক্ষত্র হচ্ছে ক্রতু আর পুলহ—প্রায় একই সরল রেখায় আছে ধ্রুব নক্ষত্র। পুলহের নিচেই পুলস্ত্য—রাবণের বাবা!

—রাবণের বাবা! মানে?

—ঐ পুলস্ত্য ঋষির স্ত্রী হলেন রাক্ষসী নিকষা। তাঁদেরই সন্তান—রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ। পুলস্ত্যের পর অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ্য আর মরীচি। সবটা মিলিয়ে অনেকটা যেন একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

হেবো অন্যমনস্কের মতো বললে, হ্যাঁ জিজ্ঞাসার চিহ্ন! অনন্ত জিজ্ঞাসা।

আমি ওকে আরও বললাম, এই গোটা সপ্তর্ষি-মণ্ডল, —শুধু তাই বা কেন, সমস্ত আকাশটাই ধ্রুব-নক্ষত্রকে পরিক্রমা করছে।

—জানি। সে-কথা দুর্লভচন্দ্রই বলেছেন —'এ-কথা ভুলিও না যে, বজ্রশালাকা বিদ্ধ ঐ ধ্রুব-নক্ষত্রের চতুষ্পার্শ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল ক্রমাগত চক্রাবর্তন করিতেছেন।' কিন্তু বজ্রশলাকা বিদ্ধ কেন?

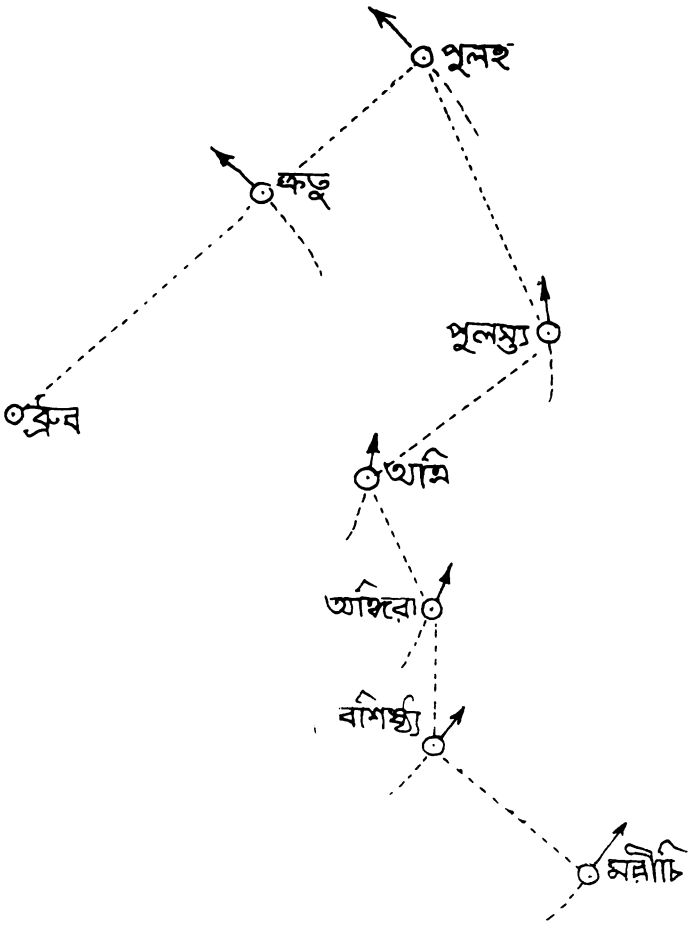

আমি পাগলটাকে সামলাবার জন্য বলি, হেবো, তুই কেন খামোকা ঐ ধাঁধাটা নিয়ে সময় নষ্ট করচিস্ বলতো? সেদিন তোর মেজদা তো, ঠিক কথাই বলেছিল। আমাদের প্রথম কাজ সুবোধচন্দ্রের দিনপঞ্জিকাখানা উদ্ধার করা। দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকা নিয়ে এভাবে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয়?

হেবো হাসল। বলল, তাহলে তোমাকে খুলেই বলি, ছোটকাকু। সুবোধচন্দ্রের দিনপঞ্জিকা খুঁজবার কোনও দরকার নেই। সেটা খুঁজে পাওয়া গেছে।

আমি চমকে উঠি। বলি, সে কি রে, সুধীরবাবুর সঙ্গে আমার আজও তো দেখা হয়েছে। কই, তেমন কথা তো তিনি কিছু বললেন না।

—সুধীরবাবু জানেন না। সেটা আমার কাছেই আছে।

আমি বজ্রাহত হয়ে যাই। ধাঁধা কষতে কষতে ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

হেবো বললে চল, নিচে যাই। তোমায় দেখাচ্ছি।

আবার নিচে নেমে এলাম আমরা। হেবো সেই দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকাখানা বার করে বললে, এটা তো তুমি খুঁটিয়ে দেখেছ, ছোটকাকু। বল তো, কোনও অসঙ্গতি তোমার নজরে পড়েছে?

আমি বলি, পড়েছে। একটা মারাত্মক ভুল আছে। একটা সংখ্যায়। দুর্লভচন্দ্র এক জায়গায় 'আট' লিখতে 'নয়' লিখেছেন। ফলে সালটা একশ' বছর ভুল হয়ে গেছে!

হেবো বললে, কারেক্ট! শেষ তারিখটা '৫ই জুন ১৮৬২' লিখতে গিয়ে ভুলে লেখা হয়েছে '৫ই জুন, ১৯৬২' জুন। তাই নয়?

—হ্যাঁ। ওটা প্রথম দিনই নজরে পড়েছিল আমার। 'অবভিয়াস' ভুল বলে তখন কিছু বলিনি।

হেবো বললে, ঐটাই হচ্ছে প্রধান 'ক্লু'! ওখানে ভুল লেখা হয়নি কিছু।

—মানে? '১৯৬২' সালটা ভুল নয়?

—না, নয়। ভুল লেখা হয়নি। ওটা ১৯৬২-ই হবে।

আমি ধমকে উঠি, কী পাগলের মতো বকছিস হেবো? দুর্লভচন্দ্র তো মারা গেছেন একশ বছর আগে! তিনি কেমন করে—

—না! তিনি নয়! ঐ সালটা লিখেছেন সুধীরবাবুর ঠাকুর্দা। বস্তুত, শেষ পৃষ্ঠার ধাঁধাটাই হচ্ছে আমাদের গুপ্তধন লাভের চাবি! শেষ পৃষ্ঠাটা সুধীরবাবুর ঠাকুর্দার লেখা।

আমি দৃঢ় প্রতিবাদ করি—আমি মানতে রাজি নই হেবো। ভুলে দুর্লভচন্দ্র 'আট'-এর বদলে 'নয়' লিখেছেন বলে—

বাধা দিয়ে হেবো বললে, না ছোটকাকু! আমি আন্দাজে কিছু বলি না। আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত!

আমি আবার ধমক দিয়ে উঠি, ঐ এক বুলি শিখেছিস! দেখছিস না—কাগজ এক, হাতের লেখা এক, কালি এক, ভাষা এক, এমন কি পূর্বপৃষ্ঠা থেকে পারম্পর্যটুকু পর্যন্ত বজায় আছে। আগের পৃষ্ঠার শেষ লাইনটা হচ্ছে "এই অতুল ঐশ্বর্য্য সমভি"—আর পরের পৃষ্ঠায়—"ব্যাহারে কী প্রকারে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব?"

হেবো বললে, ঐ একটি লাইনের আর কোন অসঙ্গতি নজরে পড়ছে না তোমার?

— কী অসঙ্গতি?

আগের পৃষ্ঠায় বানান রয়েছে "ঐশ্বর্য্য" আর পরের পৃষ্ঠায় "প্রত্যাবর্তন"?

—তাতে কী?

—ভেবে দেখ, ছোটকাকু! লক্ষ্য করে দেখ—প্রথম দুটি পৃষ্ঠায়, অর্থাৎ ৩রা এবং ৪ঠা জুন

বানান রয়েছে—সূয্যাস্ত, পূর্বেই, সর্বত্র; পার্শ্ববর্তী গর্ত্ত, পার্শ্বতীপুর, নির্দেশ, আশ্চর্য্য প্রত্যাবর্ত্তন ঐশ্চয্য' অথচ শেষ পৃষ্ঠায়—'প্রত্যাবর্তন, ঐশ্বর্য, নির্দেশ, জ্যোতির্ময়, চক্রাবর্তন, আশীবাদ'! দেখেছ।

দেখেছ? সোজা কথায় শেষ পৃষ্ঠায় 'রেফ' -এর পর দ্বিত্ব-বর্জন করা হয়েছে। তুমি তো জান, ছোটকাকু, এই রেফ-এর পর দ্বিত্ব-বর্জন করার নীতিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই শতাব্দিতে চালু করেছে। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমের কোনও পাণ্ডুলিপিতে এসব বানান পাওয়া সম্ভব? তাহলে শেষ পৃষ্ঠায় দুর্লভচন্দ্রের মতো পণ্ডিত এতবার বানান ভুল করলেন কেমন করে? অথবা তিনি কেমন করে জানলেন পরবর্তী শতাব্দীতে এ বানান চালু হবে?

আমি অবাক হয়ে যাই ওর বিশ্লেষণী শক্তিতে। সত্যিই তো। প্রথম দুটি পৃষ্ঠায় রেফের পর একটিমাত্র ক্ষেত্রেও দ্বিত্ব বর্জন করা হয় নি; আর শেষ পৃষ্ঠায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাই করা হয়েছে!

হেবো বললে, সুধীরবাবুর ঠাকর্দা বুদ্ধিটা করেছিলেন ভালই। একই কাগজ যোগার করে, একই হাতের লেখা নকল করে পুঁথিতে নিজের লেখা পাতাটা এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছেন যে, সহজে ধরাই যায় না এটা প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু দু-দুটি স্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি দিয়ে গেছেন। ১৯৬২ সালটা স্পষ্ট করে লিখেছেন—তিনি জানতেন, সাধারণ লোক হয় এটা খেয়াল করবে না, অথবা মনে করবে সংখ্যাটি ভুলে 'আট' লিখতে 'নয়' লেখা। কিন্তু রেফের পর দ্বিত্ব বর্জন করে তিনি ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন এটা তাঁরই লেখা।

মনে হল, হয়তো ঠিকই বলছে হেবো। ঐ পুঁথির শেষ পৃষ্ঠাটা দুর্লভচন্দ্রের নয়, তাঁর নাতি সুবোধচন্দ্রের লেখা। তা যদি হয়, তাহলে ঐ শেষ পৃষ্ঠাতেই সুবোধচন্দ্র ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন ১৯৬২ সালে তিনি কোথায় গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম হেবোকে—তা এই ধাঁধাটার কিছু বুঝতে পেরেছিস?

—ঐ "কূপগবাক্ষের বিপরীতমুখী বেদব্যাসের পরিমাণ—দশ আলোকবর্ষ কথাগুলোর মানে বুঝিনি। কিন্তু তার পরবর্তী নির্দেশটা বোঝা যায় "তুলাদণ্ড : এক আলোকবর্ষ—একমিমি"।

অবাক কাণ্ড! হেবো ওর মানে বুঝতে পেরেছে! জিজ্ঞাসা করি, কী ওর মানে?

—সমস্যা সমাধান করতে করতে আমরা একটা ম্যাপ পাব। সুবোধচন্দ্র এখানে বলছেন সেই ম্যাপের স্কেলটা। "তুলাদণ্ড" ইংরাজী করলে হয় 'Scale'। 'একমিমি' মানে হচ্ছে 'এক মিলিমিটার'। যে ম্যাপটা পাব তার স্কেল হচ্ছে এক আলোকবর্ষ = এক মিলিমিটার!

আমি বলি, আলোকবর্ষ কী জানিস তো? আলোক-তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বা ৩,০০,০০০ কিলোমিটার যায়। ঐ গতিতে সে এক বছরে যে দূরত্ব যেতে পারে তাকেই বলে 'আলোকবর্ষ'।

হেবো বললে, তা জানি। সেসব তথ্য এখানে কাজে লাগবে না। এখানে যে দূরত্বগুলি বলা হয়েছে সেগুলি সোজা মিলিমিটারে প্রকাশ না করে উনি প্যাঁচ কষে প্রকাশ করেছেন

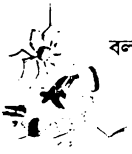

আলোকবর্ষ আর বলেছেন প্রতিটি আলোকবর্ষ = এক মিলিমিটার। অর্থাৎ যে ম্যাপটা পাব তাতে ধ্রুব নক্ষত্র থেকে ক্রতুর দূরত্ব ৪৯ মিলিমিটার। পুলহের দূরত্ব ৭৯ মিলিমিটার ইত্যাদি। কিন্তু ম্যাপটা কোথায় পাই?

আবার দুজনে ভাবতে থাকি। শেষে হেবো বলে, তুমি নিজের মতো করে ভাব ছোটকাকু, আমি আমার ঘরে গিয়ে ভাবি। ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স নিয়ে ভাবতে হবে। মনে হচ্ছে জ্যামিতির মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছানো যাবে। সুবোধচন্দ্র যেভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আগে দেখি সেভাবে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে নিছক জ্যামিতির অঙ্ক হিসাবে আঁকা যায় কিনা।

আমি তো হেবোর মতো পাগল নই। তাই নিজের নথিপত্র নিয়ে লিখতে বসি।

একটু পরে হেবো ফিরে এসে বললে, ছোটকাকু অনেকটা হয়েছে। এই দেখ কুটচক্রের ভেদসূত্রের কৃষ্ণিকা দিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে আঁকা গেছে।

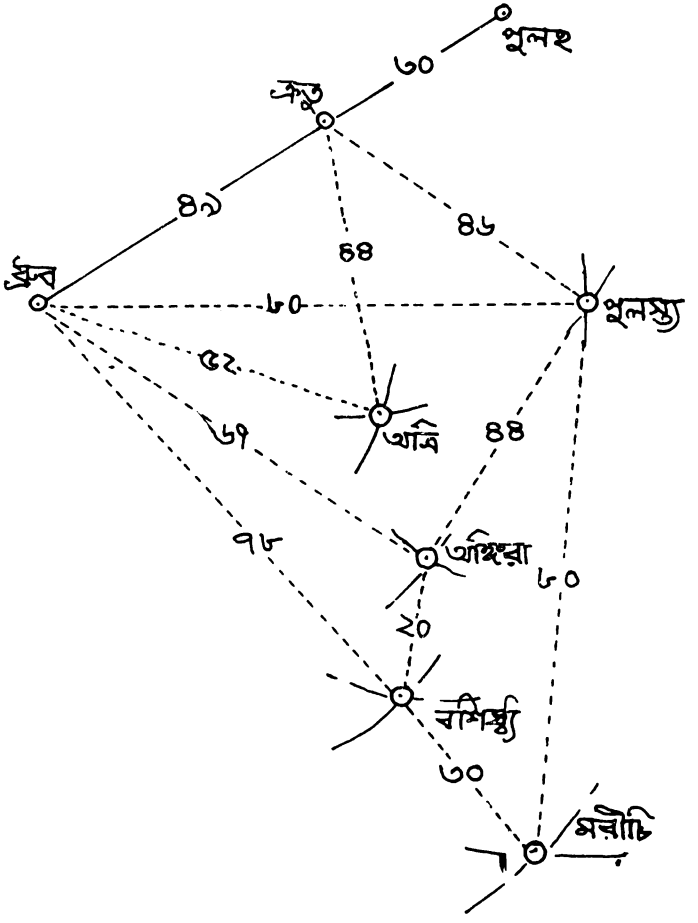

কৌতূহলী হয়ে বলি, কেমন করে?

—এই দেখ। তুমি বলেছ—ধ্রুব ক্রতু আর পুলহ একই সরলরেখায় অবস্থিত। আরও বলা হয়েছে ধ্রুব থেকে ক্রতু আর পুলহের দূরত্ব ৪৯ মিমি আর ৭৯ মিমি। ফলে, তিনটি নক্ষত্রকে পাওয়া গেল। এবার ধ্রুব আর ক্রতুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে ৫২ মিমি আর ৪৪ মিমি ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্তচাপ আঁকলে তাদের ছেদবিন্দুতে পেলাম 'অত্রি'কে। তারপর অত্রি আর ক্রতুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে ৩৪ এবং ৪৬ মিমি ব্যাসার্ধ নিয়ে দুটি বৃত্তচাপ আঁকলে পাওয়া যাচ্ছে পুলস্ত্যকে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সাত ঋষি আর ধ্রুব নক্ষত্রকে স্কেলে আঁকা যায়।

স্বীকার করতেই হল—তা যায়। কিন্তু তাতে কী হল?

হেবো বললে, হল এইটুকুই যে, আমরা একটা ধাপ অতিক্রম করলাম। এবার বেদব্যাসের কুপগবাক্ষটাকে খুঁজে পেলেই—

অন্যমনস্কের মতো আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে হেবো নিজের ঘরে চলে গেল। আমি আবার খাতাপত্র টেনে নিয়ে লিখতে বসি। কিন্তু কিছুতেই কিছু লিখতে পারলাম না। ঘুরে ফিরে ঐ ধাঁধাটাই মাথার ভিতর পাক খেতে থাকে। হেবো কি সত্যিই এক ধাপ অতিক্রম করেছে? কেমন করে? গুপ্তধন লুকানো আছে এলাহাবাদ শহরের আট মাইল দূরে একটা ভাঙা বাড়িতে। একশ বিঘা যার চৌহদ্দী। আর সপ্তর্ষিমণ্ডল আছে আকাশে। সুতরাং . . .

এইসব আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। ঘড়িতে দেখি রাত দুটো। ব্যাপার কি? দরজা খুলেই দেখি—শ্রীমান হেবো।

—কী চাই? —আমি বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করি।

—বেদব্যাসকে বিপরীতমুখী করা গেছে, ছোটকাকু।

ভীষণ রাগ হয়ে গেল আমার। বললাম, ফের যদি মাঝরাতে এমন 'বেদব্যাস বেদব্যাস' কর, তোমার বাবাকে বলে দেব কিন্তু।

হেবো ম্লান হয়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে, ও তুমি ঘুমাচ্ছিলে বুঝি?

—তুমি কি ভাবলে! রাত দুটোর সময় আমি দাঁত মাজছিলাম?

হেবো কেঁচো! কোন রকমে পালিয়ে বাঁচে। আমি আবার শুয়ে পড়ি। ঘুম আসে না কিন্তু। মহাকবি বেদব্যাসকে বিপরীতমুখী ও কেমন করে করল? আহা! বেচারাকে অমন ধমক না দিলেই ভাল হতো।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই হেবোর ঘরে গেলাম। হতভাগা অঘোরে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। বিছানায় ছড়ানো রয়েছে স্কেল, কম্পাস, খাতা পেনসিল। মায়া হল, কী জানি—কত রাত পর্যন্ত জেগেছে বেচারা।

বেলা নটা নাগাদ হেবো উঠল। বললাম, কি রে? কাল রাতে বকেছি বলে রাগ করেছিস নাকি?

হেবো একগাল হেসে বললে, না ছোটকাকু। তবে সমাধান করে ফেলেছি। তোমার বন্ধুকে বল আমাদের জন্য এলাহাবাদ যাবার টিকিট কাটতে হবে না। আমি এখানে থেকেই বলে দিতে পারব—ঐ বাড়ির ঠিক কোথায় গুপ্তধনটা পোঁতা আছে।

বাহাদুর ছেলে বটে! বলি, কেমন করে? কালরাত্রে কী জানতে পেরেছিস তুই!

—এই দেখ! 'কূপ-গবাক্ষ' হচ্ছে কাগজে একটি ফুটো। ধ্রুব বাদে ছয়টা ফুটো করতে হবে কাগজে। সপ্তর্ষি-মণ্ডলের ঐ জ্যামিতিক নকশায়—ছয় ছয়টা নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে। আর সেই ফুটোগুলোর ব্যাস হবে দশ মিলিমিটার।

—কেমন করে বুঝলি?

—'বেদব্যাসের' শব্দটাকে 'বিপরীতমুখী করলে পাই 'ব্যাসের বেদ' —অর্থাৎ 'ব্যাসের মাপ'। বলা হয়েছে সেটা দশ আলোকবর্ষ। যেহেতু এক আলোকবর্ষ = এক মিলিমিটার, তাই ফুটোগুলো দশ মিলিমিটার বা এক সেন্টিমিটার ব্যাসের হবে। কেমন তো?

--বেশ, তা না হয় হল তারপর?

—তারপর ধ্রুব-নক্ষত্রকে তীব্র শলাকায় বিদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ আমার এইফুটো-ওয়ালা কাগজখানা পাণ্ডুলিপির ঐ গুপ্তধন সঙ্কেতের রচনার উপর এমন ভাবে বসাতে হবে যাতে ধ্রুব নক্ষত্র ধ্রুব নক্ষত্রের উপর পড়ে।

আমি বলি, থাম থাম—পাণ্ডুলিপির ঐ লেখায় ধ্রুব নক্ষত্র কোথায়?

—তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে ছোটকাকু। 'ধ্রুব নক্ষত্রের অবস্থান 'অবস্থানের' জ্যোতির্ময় আদিবিন্দুতে। লক্ষ্য করে দেখ, 'শতাভিষার অবস্থানের জন্যই' কথাগুলি লিখে ঐ 'অবস্থান' শব্দটির 'অ' অক্ষরটির পুটুলিতে একটি জ্যোতি-চিহ্ন আছে। ঐটাই ধ্রুব নক্ষত্রের অবস্থান। ফুটো-ওয়ালা কাগজটা ঐ লেখাটির উপর এমন ভাবে বসাতে হবে যাতে উপরের কাগজের ধ্রুব নক্ষত্র নিচের কাগজের 'অবস্থান' শব্দটির অ-বিন্দুর পুটুলির উপর পড়ে। তারপর একটা আলপিন দিয়ে ধ্রুব নক্ষত্র দুটিকে বিদ্ধ করে উপরের কাগজখানা ঘোরাতে হবে—ঠিক যেভাবে আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল ধ্রুব নক্ষত্রকে বেষ্টন করে, কারণ নির্দেশ 'ভুলিও না য়ে, বজ্র শলাকাবিদ্ধ ঐ ধ্রুব-নক্ষত্রের চর্তুপার্শ্বে সপ্তর্ষিগুল ক্রমাগত চক্রাবর্তন করিতেছেন।'

আমি বলি, বুঝলাম। ধর তাই করলাম, তাতেই বা কেমন করে বুঝব—গুপ্তধন কোথায় আছে?

—তুমি করেই দেখ না ছোটকাকু। খুব ধীরে ধীরে ঘোরাতে থাকো—আর লক্ষ্য করে দেখ—ফুটোর মধ্যে দিয়ে কী দেখা যাচ্ছে।

ওর নির্দেশমতো ধ্রুব নক্ষত্রকে বজ্রশলাকা-বিদ্ধ করে আমি উপরের কাগজখানা ধীরে ধীরে ঘোরাতে থাকি। আশ্চর্য! হেবো যা বলেছে তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। কলকাতায়

বসেই নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া গেল--সুবোধচন্দ্রর ঐ একশ বিঘা জমির ঠিক কোথায় লুকানো আছে সেই গুপ্তধন।

বিশ্বাস না হয় তোমরাও চেষ্টা করে দেখতে পার। নেহাত যদি জ্যামিতি জানা না থাকে তবে দাদা-দিদি মামা-মামী কাউকে পাকড়াও কর। তাঁকে দিয়ে আঁকিয়ে নাও। তাঁর সাহায্য নিয়ে একটা কাগজে প্রথমে সপ্তর্ষি মণ্ডলকে এঁকে ফেল। তার পর কোদাল নয়, কাঁচি দিয়ে ছয়-ছয়টা কুপ খুঁড়তে হবে। অর্থাৎ ছয়টা ফুটো করতে হবে—ফুটোগুলির কেন্দ্র ধ্রুব বাদে ঐ সপ্তর্ষি-ঋষির অবস্থান, ব্যাস এক সেন্টিমিটার। এবার সুবোধচন্দ্রের ঐ লেখার উপর তোমার ছবিটা বসাও—এমন ভাবে, যাতে তোমার আঁকা ধ্রুব-নক্ষত্র ঐ 'অবস্থান' শব্দের 'অ' অক্ষরের পুটুলির উপর পড়ে। একটা আলপিন দিয়ে দুই ধ্রুব নক্ষত্রকে বিদ্ধ কর। তারপর ধীরে ধীরে উপরের কাগজখানা ধ্রুব নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘোরাতে থাক। কী গুপ্তধনের সন্ধান পেলে? নেহাত না পেলে শেষ পৃষ্ঠার ছবিখানা দেখে নাও! কিন্তু না! আগেভাগেই ঐ সমাধানটা তোমারা দেখ না! গোয়েন্দা গল্প তো অনেকক্ষণ হল, এবার একটু জ্যামিতির খেলাই হোক না! তাছাড়া নিজে নিজে সমাধান করতে পারার একটা আলাদা আনন্দ আছে। যতক্ষণ না পারছ—কিছুতেই সমাধানটা দেখবে না কিন্তু! শার্লক হেবোর দোহাই!

দুন্দুভি মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজিয়া উঠিল।
গ্রহাচার্য আমার জন্ম-পত্রিকা বিচার করিলেন।
তখন প্রশ্ন-উত্তরের মারফৎ জানিলাম যে
আমার শনির দশা। রাহু আছেন পঞ্চমস্থানে,
দেবগুরু বৃহস্পতি চতুর্বিংশতি নক্ষত্র শত-ভিষার
অবস্থানের জন্য আমার এই দুঃসময় চলিতেছে।
গ্রহাচার্য তখন আমার হস্ত রেখা বিচার করিয়া
বলিলেন আশঙ্কা করার কিছু নাই। বৃহস্পতির
সংক্রমণের পরে অর্থাৎ এ দূরে সৌভাগ্য-সূর্যের
উদয় সম্ভাবনা।

বুঝিলাম তখন নূতন করিয়া সব
রকম বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহার অর্থ
আমার দুর্দিনের অবসান ঘটিবে মকর সংক্রান্তিতে।

—০—